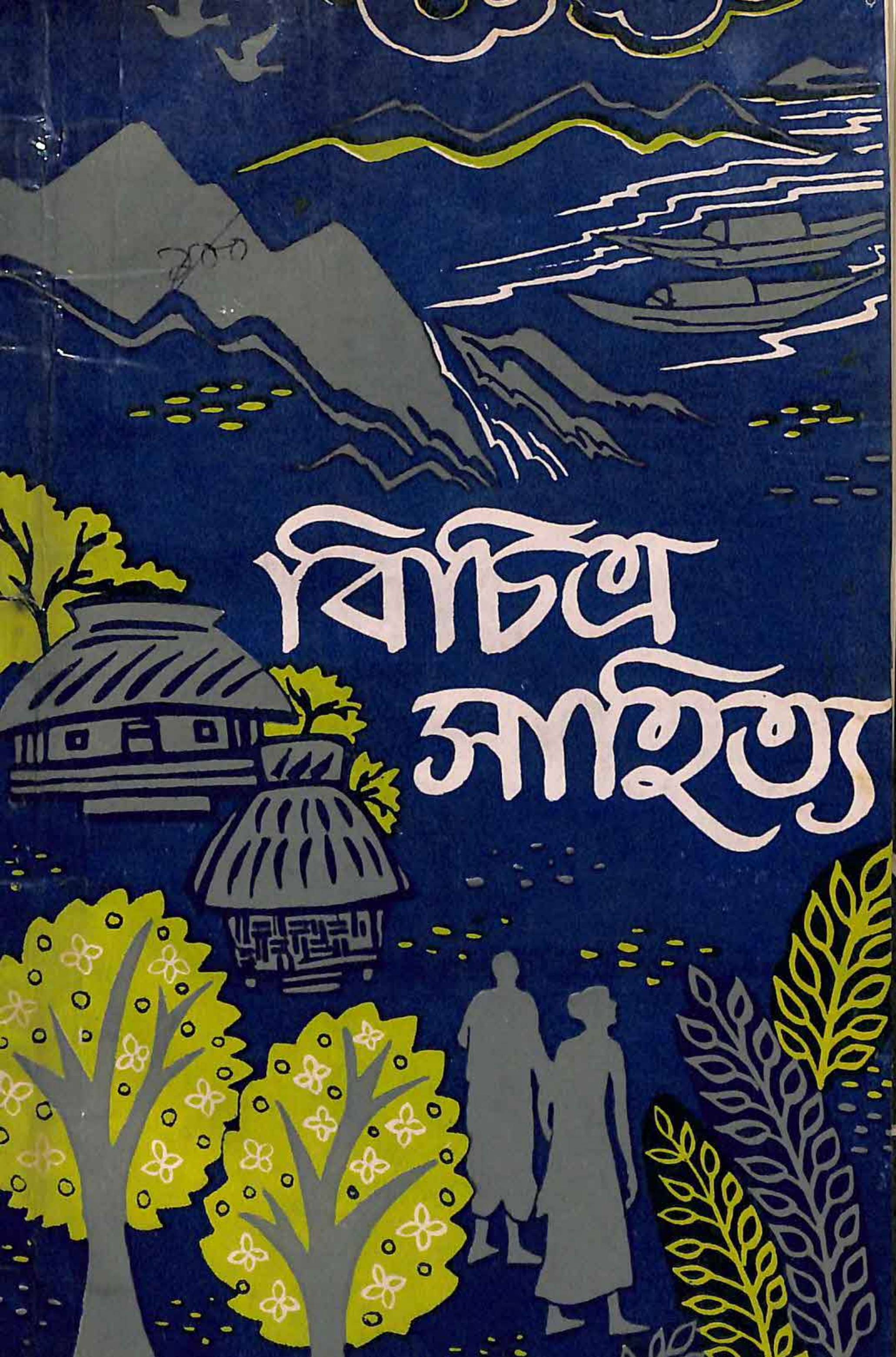

বিচিত্র
সাহিত্য

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যক্রম
অনুসারে লিখিত দ্রুতপঠন (১৯৮৮)

বিচিত্র সাহিত্য

(সপ্তম শ্রেণীর দ্রুতপঠন)

১৫০

রঞ্জনা চৌধুরী এম. এ.

ভারত পাবলিশার্স
১৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশিকা :
স্বাতী ভট্টাচার্য
ভারত পাবলিশার্স
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৮৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯

মূল্য : দশ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
অন্নপূর্ণা পাল
শ্রীদুর্গা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৮, ডাঃ কার্ত্তিক বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

□ সূচীপত্র



কবিবর ৺ভারত চন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত

— *ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত*

লেখক ঃ মধুসূদনের পূর্ববর্তী কালের প্রধান কবি, লেখক, সাংবাদিক ও 'দৈনিক প্রভাকর' সংবাদপত্রের সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্ম ১৮১২ এবং মৃত্যু ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে ; জন্মস্থান ঃ নদীয়া জেলায় গ্রাম-কাঁচরাপাড়ায়। প্রধানত কবি ও সাংবাদিক হিসাবে সুপরিচিত হলেও ভারতচন্দ্র গদ্যরচনাতেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বাংলার প্রকৃতি ও মানুষ, বাঙালির খাদ্য রুচি মানসিকতা উৎসব-অনুষ্ঠান চারিত্রিক অসঙ্গতি-বিসঙ্গতি আনন্দ-উল্লাস প্রভৃতি নিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত অনেক মজাদার ব্যঙ্গাত্মক ও হাস্যরসাত্মক কবিতা লিখেছিলেন। অনাধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এই ঈশ্বর গুপ্ত। □

মূল রচনা ঃ ঈশ্বর গুপ্তের রচনাসংগ্রহ থেকে 'কবিবর ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত' রচনাটি নেওয়া হয়েছে। □

রচনা-সম্পর্কে ঃ নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি ভারতচন্দ্র রায় মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর রচিত 'অন্নদামঙ্গল' বাংলা কাব্যের ইতিহাসে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ; কেননা এই কাব্যের ভেতরেই সর্বপ্রথম মানবিকতার স্ফুরণ এবং আধুনিক যুক্তিবাদী চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ দেখা যায়। ঈশ্বর গুপ্ত অত্যন্ত প্রথিতযশা সাংবাদিক ছিলেন। সাংবাদিকের কাজের ফাঁকে ফাঁকে গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে তিনি বহু প্রাচীন বিস্মৃতপ্রায় কবির জীবনী ও জীবন সম্পর্কে নানান তথ্যপঞ্জী সংগ্রহ করতেন। বর্তমান রচনাটি সেই গবেষণাকাজের একটি নিদর্শন। ঈশ্বর গুপ্ত কত সহজ, সাবলীল এবং বিষয়নিষ্ঠ গদ্যরচনা লিখতেন তার পরিচয় আছে এই নিবন্ধটিতে। □

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগরে গমন করিলে পর ভারতচন্দ্র তথায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা তাঁহাকে পাইয়া পরিতুষ্ট হইয়া ৪০ টাকা মাসিক বেতন নির্দিষ্ট করত বাসা প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন, 'তুমি প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যার পর আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবা।' তিনি তদনুসারে তন্নগরে থাকিয়া প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে রাজসভায় উপস্থিত হন, এবং মধ্যে মধ্যে দুই-একটি কবিতা রচনা করিয়া রাজাকে দেখান।

নবদ্বীপাধিপতি প্রফুল্লিত হইয়া কবি-শ্রেষ্ঠ ভারতচন্দ্রকে 'গুণাকর' উপাধি প্রদান করত আজ্ঞা করিলেন, 'ভারত! তোমার প্রণীত কবিতায় আমার মনে অত্যন্ত প্রীতি জন্মিয়াছে। কিন্তু আমি এবম্প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্য শুনিতে ইচ্ছা করি না।' ভারত বলিলেন, 'মহারাজ! কিরূপ রচনা করিতে অনুমতি করেন?' রাজা কহিলেন, 'মুকুন্দরাম চক্রবর্তী যিনি 'কবিকঙ্কণ' নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি যে প্রণালী-ক্রমে ভাষা-কবিতায় 'চণ্ডী' রচিয়াছিলেন, তুমি সেই পদ্ধতিক্রমে 'অন্নদামঙ্গল' পুস্তক প্রস্তুত কর।'

সেই আজ্ঞা পালন-পূর্বক কবিকেশরী অন্নদামঙ্গল বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। একজন ব্রাহ্মণ লেখকরূপে নিযুক্ত হইয়া তৎসমুদয় লিখিতে লাগিলেন, এবং নীলমণি সমাদার নামে একজন গায়ক সেই সকল 'পালা'ভুক্ত গীতের সুর, রাগ এবং পাঁচালী শিক্ষা করিয়া প্রতিদিন গান করিতে লাগিলেন। রচনা সমাধার পূর্বে রাজা তদ্দৃষ্টে অনির্বচনীয় সন্তোষ-পরবশ হইয়া কহিলেন, 'বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান সংক্ষেপে বর্ণনা করত ইহার সহিত সংযোগ করিতে হইবে।' পরে তিনি অতি কৌশলে 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করিয়া রাজাকে দেখাইলেন। নৃপতি তদ্দর্শনে আহ্লাদ রাখিবার স্থান প্রাপ্ত হইলেন না। ঐ 'অন্নদা-মঙ্গল' এবং 'বিদ্যাসুন্দরে'র গুণের ব্যাখ্যা আমি কি করিব? তাহার উপমার স্থল নাই বলিলেই হয়। এই ভারতে ভারতের ভারতীর ন্যায় ভারতের ভারতী সমাদৃত ও প্রচলিত হইয়াছে।—এই চারু গ্রন্থের পর 'রসমঞ্জরী' রচনা করেন, তাহাও সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট

হইয়াছে। 'অন্নদামঙ্গল', 'বিদ্যাসুন্দর', 'ভবানন্দ মজুমদারের পালা', এ তিন একই পুস্তক, কেবল 'রসমঞ্জরী'খানি স্বতন্ত্র।

পাণ্ডিত্য এবং কবিত্বগুণে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র নৃপেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের অতিশয় প্রিয় সভাসদ্‌রূপে গণ্য হইলেন। এইভাবে কিছুদিন গত হইতে হইতে রাজা এক দিবস জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এখানে রহিয়াছ, তোমার পরিবার কোথায়? তুমি বাটীর তত্ত্বাবধান কর কি না?' ভারত কহিলেন, 'আমার স্ত্রী আমার শ্বশুরালয়ে আছেন। ভ্রাতাদিগের সহিত আমার তাদৃশ সদ্ভাব নাই। এজন্য বাটী যাইবার অভিলাষ নাই। গঙ্গাতীরে কিঞ্চিৎ স্থান পাইলে স্বতন্ত্র একখানি বাড়ি প্রস্তুত করিয়া তথায় পরিবার লইয়া স্বচ্ছন্দে বাস ও সংসারধর্ম করিতে পারি।' রাজা কহিলেন, 'নবদ্বীপ হইতে কলিকাতা পর্যন্ত আমার অধিকার মধ্যে। কোন্ স্থানে বাস করিতে তোমার ইচ্ছা হয়?' কবি কহিলেন, 'ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের কৃপায় আমি কল্পতরুর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব তাঁহার বাটীর নিকটে হইলেই ভাল হয়, যেহেতু তাঁহার সহিত সর্বদাই সাক্ষাৎ করিতে পারি।' রাজা কহিলেন, 'তবে তুমি মূলাযোড়ে গিয়া বসতি কর।' ভারত কহিলেন, 'যে আজ্ঞা মহারাজ, ঐ স্থানটিই আমার অত্যন্ত মনোনীত হইয়াছে।' পরে উল্লেখিত পণ্ডিত ও কবি-প্রতিপালক বিদ্যানুরাগী নরবর নৃপবর ভারতকে বাটীর নিমিত্ত একশত টাকা এবং ৬০০ টাকা বার্ষিক রাজস্ব নির্দেশ-পূর্বক মূলাযোড়খানি ইজারা দিলেন।

ভারত সেই টাকা এবং ইজারার সনন্দ লইয়া শ্বশুরালয়ে গিয়া ভার্যাকে মূলাযোড়ে আনয়ন করত প্রথমে তথাকার ঘোষাল মহাশয়-দিগের ভবনে একটি ঘর লইয়া কিছুদিন তাহারই মধ্যে বাস করিলেন। পরে নূতন নিকেতন নির্মাণপূর্বক যথারীতিক্রমে অনুষ্ঠান করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। —তাঁহার পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া পুত্রদিগকে কহিলেন, 'ভারত মূলাযোড়ে গঙ্গাতীরে বাড়ি করিয়াছে। আমার প্রাচীন শরীর, এই বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাহীন দেশে বাস করা কর্তব্য হয় না।' এই বলিয়া তিনি মূলাযোড়ে আগমন

করিলেন, এবং এখানে অল্পকাল বাস করিয়াই তিনি লোকান্তরিত হইলেন। পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইলে রায় গুণাকর পুনর্বার কৃষ্ণনগরে গিয়া কিয়ৎকাল বাস করত…'বসন্ত' ও 'বর্ষা' বর্ণনা এবং আর-আর কবিতা রচনা করেন। —এই সকল পদ্য অদ্য পর্যন্ত মুদ্রিত ও প্রচারিত হয় নাই।

অনুশীলনী

□ বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১।। ভারতচন্দ্র নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে রাজা কিভাবে তাঁর আনুকূল্য করেন ?

২।। 'অন্নদামঙ্গল' রচনা সম্পর্কে কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে কিভাবে পরামর্শ দেন ?

৩।। 'নৃপতি তদ্দর্শনে আহ্লাদ রাখিবার স্থান প্রাপ্ত হইলেন না।'—নৃপতিটি কে ? তাঁর এই আহ্লাদ কেন ? 'তদ্দর্শনে' নৃপতি কি মন্তব্য করেন ?

৪।। ভারতচন্দ্র কি কি গ্রন্থ রচনা করেন ?

৫।। ভারতচন্দ্র কিভাবে মূলাযোড় গ্রামখানি লাভ করেন ?

□ আলোচনামূলক সংক্ষিপ্ত/মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১।। ভারতচন্দ্র কত টাকা বেতনে কাজ শুরু করেন ?

২।। কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে কি উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন ?

৩।। ভারতচন্দ্র মোট কয়খানি গ্রন্থ রচনা করেন ? সেগুলির নাম কি ?

৪।। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী কে ? ভারতচন্দ্র কাকে 'কল্পতরু' বলে আখ্যাত করেছিলেন ? কেন ?

৫।। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মূলাযোড় গ্রামখানি কোন্ শর্তসাপেক্ষে ভারতচন্দ্রকে ইজারা দেন ?

৬।। নরেন্দ্রনারায়ণ কে ? তিনি মূলাযোড়ে বাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন কেন ?

৭।। ভারতচন্দ্র শেষ জীবনে কৃষ্ণনগরে কিছুকাল বাসের সময় কি কি কবিতা রচনা করেন ?



রাইমণির স্নেহ — ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর

লেখক : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮২০ ; মৃত্যু ২৯ জুলাই, ১৮৯১। জন্মস্থান : মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রাম। পিতা ঠাকুরদাস, মাতা ভগবতী দেবী। গ্রামে পাঠশালার পাঠ শেষ করে কলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজে বারো বছরে কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায়, জ্যোতিষ প্রভৃতি পাঠ করে অসামান্য ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং বিদ্যাসাগর উপাধি প্রাপ্ত হন। পরবর্তী জীবনে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। বাংলা দেশের শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। বিধবা বিবাহ প্রচলন ও স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে তাঁর ভূমিকা অসাধারণ। বাংলা গদ্যের প্রবর্তন ও বিকাশে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে তাকে 'বাংলা গদ্যের জনক' বলে অভিহিত করা হয়। বহু পাঠ্যগ্রন্থের প্রণেতা তিনি। তাঁর রচিত সব গ্রন্থই পাঠোদ্দেশ্যেই রচিত। তথাপি বেতাল পঞ্চবিংশতি, কথামালা, চরিতাবলী, ভ্রান্তিবিলাস, শকুন্তলা, সীতার বনবাস প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের সম্পদরূপে গণ্য। □

মূল গ্রন্থ : বিদ্যাসাগরের অসম্পূর্ণ 'আত্মচরিত' গ্রন্থ থেকে 'রাইমণির স্নেহ' গদ্যাংশটি নেওয়া হয়েছে। □

রচনা-সম্পর্কে : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই বাংলা গদ্যের প্রকৃত স্রষ্টা। তিনি একদিকে যেমন খুব গুরুগম্ভীর গদ্য ভাষায় 'সীতার বনবাসে'র মতো গ্রন্থ লিখেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ এবং চলিত রীতি-প্রধান গদ্যভাষায় 'আত্মচরিত' রচনা করেছিলেন। নারীজাতির

প্রতি বিদ্যাসাগরের কেন বেশি দুর্বলতা ছিল তা আমরা এই রচনাটি থেকেই জানতে পারি। বাঙালি নারীর মমতাময়ী মাতৃমূর্তি তাঁর জীবনে বিরাট প্রভাব বিস্তৃত করেছিল। তাঁর চরিত্রে মাতা ভগবতী দেবীর প্রভাবও কম ছিল না। নারীজাতির প্রতি গভীর সংবেদনাবশত তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলন, স্ত্রীশিক্ষা প্রসার প্রভৃতি ব্যাপারে নিঃশর্তে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। অত্যন্ত স্বচ্ছ সুন্দর গদ্যভাষা এই রচনার বৈশিষ্ট্য। □

পিতামহদেবের দেহত্যাগের পর, পিতৃদেব আমায় কলিকাতায় আনা স্থির করিলেন। তদনুসারে, ১২৩৫ সালের কার্তিক মাসের শেষভাগে, আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম। বড়বাজার নিবাসী ভাগবতচরণ সিংহ পিতৃদেবকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তদবধি তিনি তদীয় আবাসেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। যে সময়ে আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম, তাহার অনেক পূর্বে সিংহ মহাশয়ের দেহত্যাগ ঘটিয়াছিল। এক্ষণে তদীয় একমাত্র পুত্র জগদ্দুর্লভ সিংহ সংসারের কর্তা। এই সময়ে, জগদ্দুর্লভবাবুর বয়ঃক্রম পঁচিশ বৎসর। গৃহিণী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তাঁহার স্বামী ও দুই পুত্র, এক বিধবা কনিষ্ঠা ভগিনী ও তাঁহার এক পুত্র, এইমাত্র তাঁহার পরিবার। জগদ্দুর্লভবাবু পিতৃদেবকে পিতৃব্যশব্দে সম্ভাষণ করিতেন; সুতরাং আমি তাঁহার ও তাঁহার ভগিনীদের ভ্রাতৃস্থানীয় হইলাম। তাঁহাকে দাদা মহাশয়, তাঁহার ভগিনীদিগকে বড় দিদি ও ছোট দিদি বলিয়া সম্ভাষণ করিতাম।

এই পরিবারের মধ্যে অবস্থিত হইয়া, পরের বাটীতে আছি বলিয়া, একদিনের জন্যও আমার মনে হইত না! সকলেই যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কিন্তু কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন আমি, কস্মিন্‌কালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ়বিশ্বাস এই, স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে, আমায় ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্ন ভাব ছিল না। ফলকথা

এই, স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্গুণ বিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবীমূর্তির ন্যায়, প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্তন করিতে করিতে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধহয় সে নির্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত সদ্গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই। আমি পিতামহীদেবীর একান্ত প্রিয় ও নিতান্ত অনুগত ছিলাম। কলিকাতায় আসিয়া, প্রথমতঃ কিছুদিন, তাঁহার জন্য, যার পর নাই, উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। সময়ে সময়ে, তাঁহাকে মনে করিয়া কাঁদিয়া ফেলিতাম। কিন্তু দয়াময়ী রাইমণির স্নেহে ও যত্নে, আমার সেই বিষম উৎকণ্ঠা ও উৎকট অসুখের অনেক অংশে নিবারণ হইয়াছিল।

অনুশীলনী

□ বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১॥ বিদ্যাসাগর কবে কলকাতায় আসেন? কলকাতায় তিনি কোথায় আশ্রয় পেয়েছিলেন? সেই পরিবারের কর্তা কে ছিলেন? সেই পরিবারে কে কে ছিলেন? তাঁদের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের কি কি সম্পর্ক হয়?

২॥ 'রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন আমি কস্মিন্‌কালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না!'—এই রাইমণি কে? লেখকের প্রতি তাঁর স্নেহের পরিচয় দাও।

৩॥ 'আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী'—লেখকের এই রকম পক্ষপাতিত্বের কারণ কি?

□ আলোচনামূলক সংক্ষিপ্ত / মৌখিক প্রশ্ন :

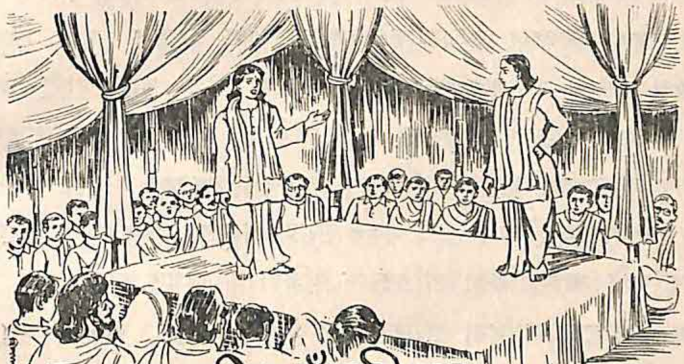
১॥ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পিতামহের নাম কি? পিতার নামই বা কি?

২॥ ভাগবতচরণ সিংহ কে? জগদ্দুর্লভবাবু কে? জগদ্দুর্লভ বিদ্যাসাগরের পিতাকে কি বলে সম্ভাষণ করতেন?

৩॥ গোপালচন্দ্র ঘোষ কে? তাঁর সঙ্গে লেখকের কি সম্পর্ক ছিল?

৪॥ লেখক কার একান্ত প্রিয় ও নিতান্ত অনুগত ছিলেন?





সেকালের কবি ও পাঁচালী গান —শিবনাথ শাস্ত্রী

লেখক ঃ মনীষী, সুপণ্ডিত, সুলেখক, শিক্ষাবিদ্ ও সমাজ-সংস্কারক শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে ২৪-পরগনার মজিলপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ; ১৯১৯-এ তাঁর মৃত্যু হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত মানবতাবাদের উজ্জল প্রতিমূর্তি শিবনাথ বঙ্গজননীর আর এক সুসন্তান। কিছুকাল শিবনাথ 'সোমপ্রকাশ' ও 'সমদর্শী' পত্রিকা দুটি সম্পাদনা করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আত্মচরিত', 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'। এছাড়াও তিনি বেশ-কয়েকটি উপন্যাস, কাব্য ও প্রবন্ধগ্রন্থ লেখেন। □

মূল রচনা ঃ 'সেকালের কবি ও পাঁচালী গান' গদ্যরচনাটি শিবনাথ শাস্ত্রীর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' থেকে নেওয়া হয়েছে। □

রচনা-সম্পর্কে ঃ শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা অত্যন্ত সুখপাঠ্য, সহজ ও আড়ম্বরহীন। অথচ বিষয়বস্তুর গুরুত্ব যথেষ্ট। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' ও 'আত্মচরিত'—তাঁর এই দুটি গ্রন্থকে একযোগে উনিশ শতকের জীবন-দর্পণ বলে অভিহিত করা চলে। উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, উৎসব, সাহিত্য ও বিবিধ সাধনা ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি কিছুই বাদ দেননি তাঁর অমূল্য এই দুটি গ্রন্থে। সেকালে কবি ও পাঁচালী গান খুবই জনপ্রিয় ছিল। শহরে ও গ্রামে হাজার হাজার মানুষের মনোরঞ্জন করত এই গান। আলোচ্য রচনাটিতে সেই দু-ধরনের গানের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের বিখ্যাত গায়কের বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। □

কবির গান সচরাচর দুই দলে হইত। কোনও একটি পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া দুই দল দুই পক্ষ হইত। মনে করুন, একদল হইল যেন কৃষ্ণপক্ষ আর একদল হইল যেন গোপী-পক্ষ। এই উভয় দলে উত্তর প্রত্যুত্তরে এক দলের পর অপর দল গান করিত। যে দল সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিত তাহাদেরই জয় হইত। এই সকল উত্তর প্রত্যুত্তর অধিকাংশ স্থলেই পৌরাণিকী আখ্যায়িকা পরিত্যাগ করিয়া ব্যক্তিগত ভাবে দলপতি-দিগের উপরে আসিয়া পড়িত এবং অতি কুৎসিত, অভদ্র, অশ্লাল ব্যঙ্গোক্তিতে পরিপূর্ণ থাকিত।···

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে সহরে হরু ঠাকুর ও তাঁহার চেলা ভোলা ময়রা, নীলুঠাকুর, নিতাই বৈষ্ণব প্রভৃতি কবিওয়ালাগণ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।···ইহাদের লড়াই শুনিবার জন্য সহরের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িত। কবিওয়ালাদিগের দলে এক একজন দ্রুতকবি থাকিত; তাহাদিগকে সরকার বা বাঁধনদার বলিত। 'বাঁধনদারেরা উপস্থিত মত তখনি তখন গান বাঁধিয়া দিত। বঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কিছুদিন কোনও কবির দলে বাঁধনদারের কাজ করিয়া-ছিলেন। দ্রুতকবিত্বের একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। সে সময়ে আণ্টুনী ফিরিঙ্গী নামে একজন কবিওয়ালা ছিল। আণ্টুনী ফরাস-ডাঙাবাসী একজন ফরাসিসের সন্তান; বাল্যকালে কুসঙ্গে পড়িয়া বহিয়া যায়; ক্রমে প্রতিভাবলে কবিওয়ালা হইয়া উঠে। আণ্টুনী নিজে একজন দ্রুতকবি ছিল। আণ্টুনী একবার গান বাঁধিল:

"ওমা মাতঙ্গি, না জানি ভকতি স্তুতি জেতে আমি ফিরিঙ্গী।"

তৎপরক্ষণেই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের দলপতি মাতঙ্গীর হইয়া উত্তর দিল:

"যিশু খ্রীস্ট ভজগে যা তুই শ্রীরামপুরের গির্জেতে,
জাত ফিরিঙ্গী জাবড়জঙ্গী পারবনাক তরাতে।" ইত্যাদি।

পাঁচালীর ব্যাপার অন্য প্রকার। ইহার কিঞ্চিৎ পরবর্তী সময়ে তাহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তাহাতে এক ব্যক্তি মূল-গায়ক

স্বরূপ হইয়া সুর ও তান সহকারে পদ্যে কোনও পৌরাণিক আখ্যায়িকা বর্ণনা করিত ও মধ্যে মধ্যে সদলে সেই ভাবসূচক এক একটি গান করিত। ইহাও লোকে অতিশয় পছন্দ করিত। লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, গঙ্গানারায়ণ নস্কর প্রভৃতি কয়েকজন পাঁচালীওয়ালা তৎকালে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু পাঁচালী গায়কদিগের মধ্যে দাশরথি রায়ের নামই সুপ্রসিদ্ধ। ইনি ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান জেলাস্থ বাদমুড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। দাশরথি প্রথমে কোনও কবির দলে বাঁধনদার ছিলেন। একবার বিরোধীদলের নিকট পরাস্ত হইয়া স্বীয় জননীর তাড়নায় সে পথ পরিত্যাগপূর্বক পাঁচালী গানের পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই পাঁচালী এত অভদ্রতা ও অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট ছিল এবং ইহাতে অসঙ্গত অনুপ্রাস ও উপমার এত ছড়াছড়ি থাকিত যে এখন আমাদের আশ্চর্য বোধহয় কিরূপে লোকে তাহাতে প্রীত হইত। কিন্তু তখন লোকে পাঁচালী গান শুনিবার জন্য পাগল হইত।

অনুশীলনী

□ বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১।। 'কবির গান সচরাচর দুই দলে হইত।' —কিভাবে হত তা লেখকের বক্তব্য অনুসরন করে লেখো।

২।। কবিগানের বিষয়বস্তু কি ছিল? এ-গানের অন্য বৈশিষ্ট্য কি ছিল?

৩।। কয়েকজন বিখ্যাত কবিওয়ালার নাম ও পরিচয় উল্লেখ করো।

৪।। দ্রুতকবি বা বাঁধনদার কাদের বলা হত? একজন বিখ্যাত কবি বাঁধনদারের নাম উল্লেখ করো।

৫।। আণ্টুনী ফিরিঙ্গী কে? তার সম্পর্কে লেখক কি জানিয়েছেন?

৬।। আণ্টুনী ও মাতঙ্গীর লড়াইয়ের একটি বর্ণনা দাও।

৭।। পাঁচালী গানের বিষয়বস্তু কি ছিল? কি ভাবে গাওয়া হত পাঁচালী গান?

৮। কয়েকজন প্রসিদ্ধ পাঁচালী গায়কের নাম উল্লেখ করো।

কবির গান সচরাচর দুই দলে হইত। কোনও একটি পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া দুই দল দুই পক্ষ হইত। মনে করুন, একদল হইল যেন কৃষ্ণপক্ষ আর একদল হইল যেন গোপী-পক্ষ। এই উভয় দলে উত্তর প্রত্যুত্তরে এক দলের পর অপর দল গান করিত। যে দল সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিত তাহাদেরই জয় হইত। এই সকল উত্তর প্রত্যুত্তর অধিকাংশ স্থলেই পৌরাণিকী আখ্যায়িকা পরিত্যাগ করিয়া ব্যক্তিগত ভাবে দলপতি-দিগের উপরে আসিয়া পড়িত এবং অতি কুৎসিত, অভদ্র, অশ্লীল ব্যঙ্গোক্তিতে পরিপূর্ণ থাকিত।…

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে সহরে হরু ঠাকুর ও তাঁহার চেলা ভোলা ময়রা, নীলুঠাকুর, নিতাই বৈষ্ণব প্রভৃতি কবিওয়ালাগণ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।…ইহাদের লড়াই শুনিবার জন্য সহরের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িত। কবিওয়ালাদিগের দলে এক একজন দ্রুতকবি থাকিত; তাহাদিগকে সরকার বা বাঁধনদার বলিত। বাঁধনদারেরা উপস্থিত মত তখনি তখন গান বাঁধিয়া দিত। বঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কিছুদিন কোনও কবির দলে বাঁধনদারের কাজ করিয়া-ছিলেন। দ্রুতকবিত্বের একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। সে সময়ে আণ্টুনী ফিরিঙ্গী নামে একজন কবিওয়ালা ছিল। আণ্টুনী ফরাস-ডাঙাবাসী একজন ফরাসিসের সন্তান; বাল্যকালে কুসঙ্গে পড়িয়া বহিয়া যায়; ক্রমে প্রতিভাবলে কবিওয়ালা হইয়া উঠে। আণ্টুনী নিজে একজন দ্রুতকবি ছিল। আণ্টুনী একবার গান বাঁধিল:

"ওমা মাতঙ্গি, না জানি ভকতি স্তুতি জেতে আমি ফিরিঙ্গী।"

তৎপরক্ষণেই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের দলপতি মাতঙ্গীর হইয়া উত্তর দিল:

"যিশু খ্রীস্ট ভজগে যা তুই শ্রীরামপুরের গির্জেতে,
জাত ফিরিঙ্গী জাবড়জঙ্গী পারবনাক তরাতে।" ইত্যাদি।

পাঁচালীর ব্যাপার অন্য প্রকার। ইহার কিঞ্চিৎ পরবর্তী সময়ে তাহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তাহাতে এক ব্যক্তি মূল-গায়ক

স্বরূপ হইয়া সুর ও তান সহকারে পদ্যে কোনও পৌরাণিক আখ্যায়িকা বর্ণনা করিত ও মধ্যে মধ্যে সদলে সেই ভাবসূচক এক একটি গান করিত। ইহাও লোকে অতিশয় পছন্দ করিত। লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, গঙ্গানারায়ণ নস্কর প্রভৃতি কয়েকজন পাঁচালীওয়ালা তৎকালে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু পাঁচালী গায়কদিগের মধ্যে দাশরথি রায়ের নামই সুপ্রসিদ্ধ। ইনি ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান জেলাস্থ বাদমুড়া গ্রামে জন্ম-গ্রহণ করেন এবং ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। দাশরথি প্রথমে কোনও কবির দলে বাঁধনদার ছিলেন। একবার বিরোধীদলের নিকট পরাস্ত হইয়া স্বীয় জননীর তাড়নায় সে পথ পরিত্যাগপূর্বক পাঁচালী গানের পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই পাঁচালী এত অভদ্রতা ও অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট ছিল এবং ইহাতে অসঙ্গত অনুপ্রাস ও উপমার এত ছড়াছড়ি থাকিত যে এখন আমাদের আশ্চর্য বোধহয় কিরূপে লোকে তাহাতে প্রীত হইত। কিন্তু তখন লোকে পাঁচালী গান শুনিবার জন্য পাগল হইত।

অনুশীলনী

□ বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১॥ 'কবির গান সচরাচর দুই দলে হইত।' —কিভাবে হত তা লেখকের বক্তব্য অনুসরণ করে লেখো।

২॥ কবিগানের বিষয়বস্তু কি ছিল? এ-গানের অন্য বৈশিষ্ট্য কি ছিল?

৩॥ কয়েকজন বিখ্যাত কবিওয়ালার নাম ও পরিচয় উল্লেখ করো।

৪॥ দ্রুতকবি বা বাঁধনদার কাদের বলা হত? একজন বিখ্যাত কবি বাঁধনদারের নাম উল্লেখ করো।

৫॥ আন্টুনী ফিরিঙ্গী কে? তার সম্পর্কে লেখক কি জানিয়েছেন?

৬॥ আন্টুনী ও মাতঙ্গীর লড়াইয়ের একটি বর্ণনা দাও।

৭॥ পাঁচালী গানের বিষয়বস্তু কি ছিল? কি ভাবে গাওয়া হত পাঁচালী গান?

৮। কয়েকজন প্রসিদ্ধ পাঁচালী গায়কের নাম উল্লেখ করো।

৯ ॥ দাশরথি রায় কে ছিলেন ? তাঁর সম্পর্কে লেখক কি জানিয়েছেন ?

□ **আলোচনামূলক সংক্ষিপ্ত/মৌখিক প্রশ্ন ঃ**

১ ॥ 'কৃষ্ণ-পক্ষ' ও 'গোপী-পক্ষ' বলতে কি বোঝায় ?

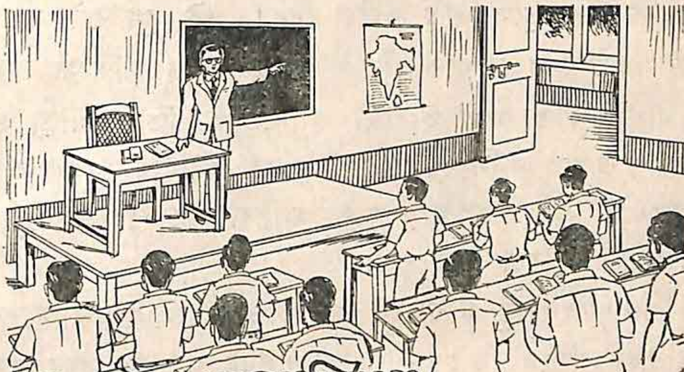
২ ॥ কবিগানে দুই দলের মধ্যে কার জয় হত ?

৩ ॥ আণ্টনী ফিরিঙ্গী কোথাকার এবং কোন্ জাতির লোক ছিলেন ?

৪ ॥ দাশরথি রায় কেন এবং কিভাবে পাঁচালী গানের পথ অবলম্বন করেন ?

৫ ॥ পাঁচালী গানের মধ্যে কিরকম রুচি প্রকাশ পেত ?





আমার বাল্যশিক্ষা — রাজনারায়ণ বসু

লেখক : রাজনারায়ণ বসু উনবিংশ শতাব্দীর এক যশস্বী লেখক, সুপণ্ডিত, মনীষী ও শিক্ষাবিদ্‌। ইনি মহাকবি মধুসূদন দত্তের বন্ধু ছিলেন। আজীবন নিযুক্ত ছিলেন শিক্ষাকার্যে। আধুনিক চেতনার উন্মেষের দ্বারা সেকালে যে কজন ব্যক্তি উজ্জীবিত হয়েছিলেন রাজনারায়ণ তাঁদের অগ্রগণ্য। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের অন্যতম কেন্দ্রীয় পুরুষ বিখ্যাত হিন্দু কলেজের প্রতিনিধিস্থানীয় ছাত্র ছিলেন। স্বাদেশিক চেতনা, স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশ-প্রেমের মূর্ত পুরুষ রাজনারায়ন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : সেকাল ও একাল, আত্মচরিত প্রভৃতি। □

মূল রচনা : লেখকের বিখ্যাত 'আত্মচরিত' গ্রন্থ থেকে 'আমার বাল্য-শিক্ষা' অংশটি নেওয়া হয়েছে। □

রচনা-সম্পর্কে : রাজনারায়ণ বসু 'আত্মচরিতে' নিজের কথা যেমন বলেছেন, তেমনি নিজের যুগের কথাও বলেছেন নানান প্রসঙ্গের মাধ্যমে। উনবিংশ শতাব্দীর দেশকাল, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানান্ বিষয় সম্পর্কে জানতে হলে 'আত্মচরিত' পড়তেই হবে। 'আমার বাল্যশিক্ষা' রচনাংশটিতে লেখক সহজ, বিশুদ্ধ ও ঝরঝরে গদ্যরীতিতে সেকালের শিক্ষাব্যবস্থার এবং নিজের শিক্ষাজীবনের সুন্দর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। □

সাত বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে পিতাঠাকুর আমাকে শিক্ষার্থ কলিকাতায় আনেন। আনিয়া প্রথমে এক গুরু-মহাশয়ের পাঠশালায়

আমাকে ভর্তি করিয়া দেন। কিছুদিন পরে ইংরাজী শিখিবার জন্য শম্ভু মাস্টারের স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। এই স্কুল বৌবাজারের একটি ছোট অন্ধকার ঘরে হইত। ছাত্রের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। শম্ভু মাস্টার অতি অল্পই ইংরাজী জানিতেন। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন ও তাঁহার নাসিকার উপর চন্দনের এক দীর্ঘ তিলক ধারণ করিতেন। তিনি অপরাহ্লে স্কুলে আসিয়া পড়াইতেন। পূর্বাহ্লে গ্রিফ সাহেব আসিয়া পড়াইতেন।

গ্রিফ সাহেব শম্ভু মাস্টারের অপেক্ষাও ইংরাজী অল্প জানিতেন। কিন্তু তাহা বলিলে কি হয়? একটি লালমুখ থাকিলে যেমন স্কুলের গুমর বাড়ে, এমন আর কিছুতেই নহে। ভুল করিলে ইঁহারা 'ফ্রেল' দ্বারা ছাত্রের হাতে মারিতেন। অনেকদিন অবধি 'ফ্রেল' শব্দের ব্যুৎপত্তি কি জানিতে পারি নাই। পরে একদিন লাটিন ভাষায় অভিধান দেখিতে 'ফেরুলা' শব্দ পাইলাম। উহা একটি কাঠের চাকতি, মস্ত বাঁট-ওয়ালা। উহা রোমানদিগের দ্বারা ও সেকালের ইংরাজদিগের দ্বারা ছাত্রকে দণ্ড দিবার জন্য ব্যবহৃত হইত।

শম্ভু মাস্টারের স্কুল হইতে হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্তি হই। তখন হেয়ার সাহেবের স্কুলের নাম 'স্কুল সোসাইটি'জ স্কুল' ছিল। 'স্কুল সোসাইটি' দ্বারা সেকালে অনেক উপকার হইয়াছে। তাঁহাদিগের প্রকাশিত রীডারগুলি অতি উত্তম পুস্তক ছিল। স্কুলের প্রকৃত নাম 'স্কুল সোসাইটি'জ স্কুল' হইলেও হেয়ার সাহেব উহার কর্তা ছিলেন। সাধারণ লোক 'হেয়ার সাহেবের স্কুল' বলিয়া ডাকিত। হেয়ার সাহেবের জীবনবৃত্তান্ত সাধারণে অবগত আছেন। যাঁহারা অবগত নহেন, তাঁহাদিগকে প্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত 'লাইফ অফ ডা. হেয়ার' পড়িতে অনুরোধ করি।

বাঙালিরা ময়লা জাতি জানিয়া, যাহাতে বাঙালি বালকেরা পরিষ্কার থাকিতে যত্নবান হয়, তজ্জন্য হেয়ার সাহেব মধ্যে মধ্যে স্কুলের ছুটি হইবার সময়ে স্কুলের ফটকে একটি তোয়ালিয়া ও বেত হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। প্রত্যেক বালকের গা তোয়ালিয়া

দ্বারা কষে ক্ষণেক রগড়াইতেন। যদি ময়লা বেরোত তাহা হইলে তাহাকে দুই-এক ঘা বেত কষাইয়া দিতেন। তিনি বালকদিগকে গা পারিষ্কার করিবার জন্য সাবান দিতেন।

প্রতি শনিবার তাঁহাকে হাতের লেখা দেখাইতে হইত। তিনি লিখিবার বিষয়ে যে-সকল উপদেশ দিতেন, সেইরূপ না লিখিলে দুই-এক ঘা বেত কষাইয়া দিতেন। তিনি একটি অক্ষর বড় ও একটি অক্ষর ছোট হইলে বড় রাগ করিতেন। আমার ভাগ্যক্রমে কখন তাঁহার নিকট হইতে বেত খাই নাই। কিন্তু আমি তাঁহার বেত্রচাল-নৈষণা নিবারণ করিবার জন্য, বেত খাইয়া একটি ছাত্রের আত্মহত্যার গল্প, আমার তখনকার ইংরাজীতে লিখিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম আমার এই গল্প হইতে তিনি উপদেশ লাভ করিবেন, কিন্তু করিলেন না। এই কার্য জন্য আমি নিজে বেত খাই নাই, এক্ষণে আমার পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করি।

আমার চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত আমি হেয়ার সাহেবের স্কুলে পড়ি। হেয়ার সাহেব আমাদের বক্তৃতা-শক্তি ও রচনা-শক্তি উন্নত করিবার অভিপ্রায়ে একটি বিতর্ক-সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। আমি তাহাতে 'বিজ্ঞান সাহিত্য অপেক্ষা শ্রেয় কি না' এই বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করি। যদ্যপি আমার গণিত ভাল লাগিত না, তথাপি আমার প্রবন্ধে আমি তাহাকেই সাহিত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা অর্পণ করিয়াছিলাম। আমি আমার প্রবন্ধে যেরূপ রচনা-শক্তি ও নিঃস্বার্থ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে হেয়ার সাহেব আমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আমার প্রতি তাঁহার অতিশয় স্নেহ জন্মিয়াছিল। তিনি পিতার ন্যায় স্নেহ-পূর্বক আমাকে বলিতেন যে, 'কত শীঘ্র তুমি বাড়িতেছ।' একবার জ্বর হওয়াতে আমি তাঁহাকে সংবাদ না দেওয়াতে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সংবাদ দিলে তিনি অবশ্য আমাকে ডাক্তার ও ঔষধ সঙ্গে লইয়া দেখিতে যাইতেন।

হেয়ার সাহেবের স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে আমি যখন পড়ি, তখন আমাদিগের তিনজন শিক্ষক ছিলেন। একজনের নাম দুর্গাচরণ

বন্দ্যোপাধ্যায়, আর একজনের নাম উমাচরণ মিত্র, তৃতীয়ের নাম রাধামাধব দে। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা। ইনি পরে কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার হইয়াছিলেন। উমাচরণ মিত্র জনাই নিবাসী ছিলেন। রাধামাধবের বাটী কলিকাতার চাঁপাতলায় ছিল। উমাচরণ হেড-মাস্টার ছিলেন। দুর্গাচরণের নিকট আমরা কত উপকৃত তাহা বলিতে পারি না। তিনিই আমাদিগের মনে জ্ঞানের ইচ্ছা এবং অনুসন্ধানের ইচ্ছার উদ্রেক করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আমাদের মনোমুকুলকে প্রথম প্রস্ফুটিত করেন। উমাচরণ আমাদিগের নিকট স্কটের 'আইভানহো', পোপের 'পোয়েন্‌স' এবং অন্যান্য গদ্য-পদ্য কাব্য উত্তম-রূপে পাঠ এবং ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগের মনে ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি যে-রূপে ওই সকল কাব্য পড়িতেন তাহা কখন ভুলিবার নহে। যে সকল গদ্য-পদ্য কাব্য তিনি আমাদিগের নিকট পড়িতেন, তাহা ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক ছাড়া। একালের কোন শিক্ষক কি এ-রূপ করিয়া থাকেন ? আর করিবারও জো নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রণালী দ্বারা হস্ত-পদ বাঁধা। রাধামাধব আমাদিগকে গণিত শিখাইতেন। চিরকালই আমি গণিত-বিদ্বেষী। গণিতের পুস্তক দেখিলে আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইত। এই রোগকে 'গণিতাতঙ্ক' রোগ বলা যাইতে পারে। গণিতের প্রতি অমনোযোগ দ্বারা রাধামাধবের মনে কতই না কষ্ট দিয়াছি।

অনুশীলনী

□ বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১॥ 'ভুল করিলে ইহারা 'ফ্রেল' দ্বারা ছাত্রের হাতে মারিতেন।'—'ফ্রেল' কি ? 'ইহারা' কারা ? 'ফ্রেল' শব্দের ব্যুৎপত্তি লেখক কিভাবে জানতে পারেন ?

২॥ শম্ভু মাস্টারের সম্পর্কে লেখক কি জানিয়েছেন নিজের কথায় লেখো।

৩ ॥ 'স্কুল সোসাইটি'জ স্কুল' সম্পর্কে লেখক কি জানিয়েছেন নিজের কথায় লেখো।

৪ ॥ হেয়ার সাহেবের স্কুলে লেখকের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা তাঁর বক্তব্যের অনুসরণে বর্ণনা করো।

৫ ॥ হেয়ার সাহেবের সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা বর্ণনা করো।

৬ ॥ এঁদের সম্পর্কে কি জেনেছো লেখো: দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমাচরণ মিত্র ও রাধামাধব দে।

৭ ॥ 'তখন আমাদের তিনজন শিক্ষক ছিলেন।'—এই তিনজন শিক্ষকের নাম লেখো এবং তাঁরা কেমন শিক্ষক ছিলেন, কে কি পড়াতেন, কেমন পড়াতেন তা লেখকের বক্তব্য অনুসরণ করে বর্ণনা করো।

□ আলোচনামূলক সংক্ষিপ্ত / মৌখিক প্রশ্ন :

১ ॥ শম্ভু মাস্টারের স্কুল কোথায় ছিল? ওই স্কুলের ইংরেজির দুজন শিক্ষকের নাম লেখো।

২ ॥ প্যারীচাঁদ মিত্র সম্পর্কে কি জানো?

৩ ॥ 'বেত্রচালনৈষণা' শব্দটির অর্থ কি? লেখক কিভাবে তা নিবারণের চেষ্টা করেন?

৪ ॥ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত কেন?

৫ ॥ স্কট কে? তাঁর 'আইভানহো' কি?

৬ ॥ পোপ কে? তাঁর 'পোয়েমস্' বলতে লেখক কি বুঝিয়েছেন?

৭ ॥ লেখক গণিতে কেমন ছিলেন? কিসের জন্য হেয়ার সাহেব লেখকের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন?



মৃত্যুপথযাত্রী মধুসূদন -যোগীন্দ্র নাথ বসু

লেখক : সুলেখক, কবি, প্রাবন্ধিক এবং সর্বোপরি মধুসূদনের জীবন-চরিতকার হিসাবে খ্যাতিমান যোগীন্দ্রনাথ বসু ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে ২৪-পরগনার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার নিতাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বি. এ. পাস করার পর তিনি দেওঘর স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে প্রধান শিক্ষকের কাজ থেকে অব্যাহতি পেয়ে কলকাতায় ফিরে এসে কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পৌত্র প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের আনুকূল্যে মধুসূদনের জীবনী গ্রন্থ রচনার পূর্ণ সুযোগ লাভ করেন। 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এছাড়া তিনি অহল্যাবাঈ, তুকারাম চরিত, পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য, শিবাজী মহাকাব্য প্রভৃতি গ্রন্থও রচনা করেন। □

মূল রচনা : 'মৃত্যুপথযাত্রী মধুসূদন' রচনাংশটি লেখকের বিখ্যাত গ্রন্থ 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত' থেকে নেওয়া হয়েছে। □

রচনা সম্পর্কে : মধুসূদনের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে লেখা 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত' একটি দুর্লভ ও অসামান্য গ্রন্থ। বহু অধ্যবসায়, গবেষণাকর্ম, প্রয়াস ও প্রযত্নে গ্রন্থখানি রচনা করেছেন যোগীন্দ্রনাথ বসু। মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর নামও অমর হয়ে রয়েছে এই গ্রন্থ রচনার জন্য। এমন নির্ভরযোগ্য, প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। বিষয়বস্তুর গুরুত্বে, ভাষার মাধুর্যে, আন্তরিকতাপূর্ণ রচনাগুণে এই চরিতগ্রন্থটি অদ্বিতীয়ই বলা চলে। আলোচ্য 'মৃত্যুপথযাত্রী মধুসূদন' রচনাংশে লেখক এক মহাকবির জীবনের অন্তিম দৃশ্যটিতে ভাবে ও ভাষায় মহাকাব্যিক বিশালতা. গাম্ভীর্য ও কারুণ্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। □

মধুসূদনের মৃত্যুর তিনদিন পূর্বে, তাঁহার শেষজীবনের সুখদুঃখ-ভাগিনী, হেনরিয়েটা, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, পরলোক গমন করিলেন। মধুসূদন তখন দাতব্য-চিকিৎসালয়ে, মুমূর্ষু অবস্থায়, অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার এক পূর্বতন ভৃত্য আসিয়া তাঁহাকে এ সংবাদ প্রদান করিল। মধুসূদনের অশ্রুর উৎস তখন শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, তিনি কেবল কাতরস্বরে বলিলেন, "জগদীশ! আমাদের দুইজনকেই একত্র সমাধিস্থ করিলে না কেন? কিন্তু আমার আর অধিক বিলম্ব নাই, আমি সত্বরই, হেনরিয়েটার অনুবর্তী হইব"।...

মনোমোহনবাবু ও মধুসূদনের আর দুই একটি সুহৃদ্ হেনরিয়েটাকে সমাধিস্থ করিয়া, দাতব্য চিকিৎসালয়ে মধুসূদনকে এই সংবাদ দিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। তিনি মনোমোহনবাবুকে দেখিয়া বলিলেন, "কেমন মনোমোহন, সকল ত ভদ্রোচিত সম্পন্ন হইয়াছে? কোনও ত্রুটি ত হয় নাই?" মনোমোহনবাবু বলিলেন, "না। আমাদিগের এ অবস্থায় যাহা সম্ভবযোগ্য, তাহার কিছুই ত্রুটি হয় নাই।" মধুসূদন তখন মনোমোহনবাবুকে বলিলেন, "মনোমোহন, তুমি যত্নের সহিত সেক্সপিয়ার পড়িয়াছিলে, ম্যাকবেথের সেই কয়টি পংক্তি কি তোমার স্মরণ হয়?" মনোমোহনবাবু বলিলেন, "কোন্ কয়টি পংক্তি?" মধুসূদন বলিলেন, "লেডি-ম্যাকবেথের মৃত্যু-সংবাদে, ম্যাকবেথ যাহা বলিয়াছিলেন, সেই কয়টি পংক্তি।......" মধুসূদন এই বলিয়া, ম্যাকবেথ হইতে সুস্পষ্টরূপে সেই কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করিলেন; ...আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, "কেমন মনোমোহন, ঠিক হইয়াছে ত?" মনোমোহনবাবু বলিলেন, "ঠিক হইয়াছে, কিন্তু এখন এ সকল কথায় প্রয়োজন কি? আপনি আরোগ্য লাভ করিবেন, চিন্তা নাই।" মধুসূদন শুনিয়া একটু হাসিলেন।...পরে মনোমোহনবাবুকে বলিলেন, "দেখ, এই চিকিৎসালয়ের পরিচারক এবং ধাত্রীদিগকে পুরস্কার দিতে পারি, আমার এমন সম্বল নাই। ইহারা অর্থপ্রয়াসী, ইহাদিগকে কিছু কিছু পুরস্কার দিলে, ইহারা আমায় একটু যত্ন করিত। যদি প্রতিদিন একটি করিয়া টাকা ব্যয় করিতে

পারিতাম, তবে এ অবস্থায়ও কিছু শান্তি পাইতাম।" মনোমোহন-বাবু বলিলেন, "প্রতিদিন একটি করিয়া টাকা? সেজন্য আপনি চিন্তা করিবেন না, যে উপায়েই হোক, তাহা সংগৃহীত হইবে।" তখন মধুসূদন বলিলেন, "মনোমোহন! তোমায় আর অধিক কি বলিব? আমার শিশুগুলি যেন অন্নাভাবে প্রণাত্যাগ না করে, এই দেখিও।" মনোমোহনবাবু বলিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, যদি আমার নিজের সন্তানগণের অন্নাভাব না হয়, তবে আপনার শিশুগুলির হইবে না!" মধুসূদনের বিশুষ্ক মুখ ক্ষণকালের জন্য প্রফুল্ল হইল; সস্নেহে মনোমোহনবাবুর হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "মনোমোহন! জগদীশ্বর তোমার কল্যাণ করুন।"

মনোমোহনবাবুর সঙ্গে এই বিদায়ের পর মধুসূদন তিন দিবস জীবিত ছিলেন। সেই তিন দিনের অধিকাংশ সময়ই তিনি নিজের অতীত জীবনের কার্যাবলীর আলোচনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্বদিন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংবাদ দিয়া আনাইয়া, তিনি অনেকক্ষণ অবধি তাঁহার সহিত ধর্মালোচনা করিয়াছিলেন, এবং ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি সেই দয়াময়ের করুণার উপর নির্ভর করিয়া মরিতেছি; তিনি যে, পাপী, তাপীর উদ্ধারের জন্য খ্রীস্টকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।" সেইদিন ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে জুন রবিবার, বেলা দ্বিপ্রহর দুইটার সময় তাঁহার প্রাণবায়ু নিঃসৃত হইল। আজ এই শেষ দিনে চিকিৎসালয়ের ভৃত্য ও শুশ্রূষাকারিণী ভিন্ন তাঁহার মুখে জলগণ্ডুষ দিবার জন্য একজনও নিকটে ছিলেন না। রাজপথের ভিক্ষুক ও অনাথগণের সহিত একত্রে বঙ্গের বর্তমান সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এইরূপে পরলোকগমন করিলেন।

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

□ বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১ ॥ হেনরিয়েটা কে? তিনি কবে মারা যান? তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনে মধুসূদন কি বলেছিলেন?

২ ॥ সেক্সপীয়র কে? 'ম্যাকবেথ' কি? মধুসূদন ম্যাকবেথের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন কেন?

৩ ॥ মনোমোহনবাবু কে? তিনি মৃত্যুপথযাত্রী মধুসূদনকে কি কি আশ্বাস দিয়েছিলেন?

৪ ॥ রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কে? মধুসূদন তাঁকে সংবাদ দিয়ে ডাকিয়ে এনেছিলেন কেন?

৫ ॥ মধুসূদন কোন্‌দিন পরলোকগমন করেন? মৃত্যুকালে তাঁর শয্যা-পার্শ্বে কারা ছিল?

৬ ॥ অল্প কয়েকটি বাক্যে মধুসূদনের মৃত্যুর করুণ দৃশ্য বর্ণনা করো।

□ আলোচনামূলক সংক্ষিপ্ত / মৌখিক প্রশ্ন :

১ ॥ হেনরিয়েটা যখন মারা যান তখন মধুসূদন কোথায় অবস্থান করছিলেন?

২ ॥ কে দাতব্য-চিকিৎসালয়ে মধুসূদনের কাছে হেনরিয়েটার মৃত্যু-সংবাদ পৌঁছে দেন?

৩ ॥ 'সকল ত ভদ্রোচিত সম্পন্ন হইয়াছে?'—এ-কথা কে, কি সম্পর্কে কাকে জিগ্যেস করেছিলেন?

৪ ॥ চিকিৎসালয়ে অবস্থানের সময় মধুসূদনের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি মনোমোহনবাবুকে কি বলেছিলেন?

৫ ॥ 'আমার শিশুগুলি যেন অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ না করে।'—এই কথাগুলি কে, কাকে বলেছিলেন? 'শিশুগুলি' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?

৬ ॥ খ্রীস্ট কে? মৃত্যুকালে মধুসূদন তাঁর আবির্ভাবের কি কারণ উল্লেখ করেছিলেন?



বসন্তের কোকিল -বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক ঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে ২৪ পরগনার নৈহাটি-কাঁঠালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক, মনীষী, স্বদেশপ্রেমিক, বন্দে-মাতরম্ সঙ্গীতের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি বাংলা সাহিত্যের সম্রাট, স্বদেশপ্রেমের উদ্‌গাতা, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে এই মহাত্মা পরলোকগমন করেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ঃ দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, রাজসিংহ, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম, আনন্দমঠ, কমলাকান্তের দপ্তর, বিবিধ প্রবন্ধ প্রভৃতি। □

মূল রচনা ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত গ্রন্থ 'কমলাকান্তের দপ্তর' থেকে 'বসন্তের কোকিল' রচনাটির অংশবিশেষ নেওয়া হয়েছে।

রচনা সম্পর্কে ঃ বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক। তাঁর রচনাভঙ্গি অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের। উপন্যাস-সাহিত্যে তিনি অদ্বিতীয়। প্রবন্ধ ও রচনা সাহিত্যেও তাঁর জুড়ি নেই। 'কমলাকান্তের দপ্তর' একটি অসাধারণ ও অতুলনীয় রচনা সংগ্রহ। মানবসমাজ, মানবজীবন ও মাবনচরিত্রের বিচিত্র দিক এবং বৈশিষ্ট্য এই গ্রন্থের রচনাগুলিতে অতন্ত কৌতুকজনক ভাষা ও ভঙ্গিতে বিবৃত হয়েছে। বসন্তের কোকিল রচনাটিতেও মানবচরিত্রের নানান দিক প্রকাশিত। কোকিলের মতো বিচিত্র, স্বার্থপর, আত্মসুখী ও পরশ্রীকাতর মানুষের অভাব নেই মানবসমাজে। বিষয়বস্তুর এই অভিনবত্বের সঙ্গে এসে মিলেছে বঙ্কিমচন্দ্রের আশ্চর্য শিল্পগুণমণ্ডিত ভাষা ও বর্ণনামাধুর্য। এ-ধরনের লেখা বাংলা সাহিত্যে আর নেই। □

তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণা বাতাস বহে, তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর। আর যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থরহরি কম্প লাগে, তখন কোথায় থাক বাপু? যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক-চিল ভিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার মাজা-মাজা কালো-কালো দুলালী ধরনের শরীরখানি কোথায় থাকে? তুমি বসন্তের কোকিল, শীত-বর্ষার কেহ নও।

রাগ করিও না—তোমার মত আমাদের মাঝখানে অনেক আছেন। যখন নসীবাবুর তালুকের খাজনা আসে, তখন মানুষ-কোকিলে তাঁহার গৃহ-কুঞ্জ পুরিয়া যায়—কত টিকি, ফোঁটা, তেড়ি, চশমার হাট লাগিয়া যায়। কত কবিতা, শ্লোক, গীত, হেটো ইংরেজী, মেটো ইংরেজী, চোরা ইংরেজী, ছেঁড়া ইংরেজীতে নসীবাবুর বৈঠক-খানা পারাবত-কাকলি-সংকুল গৃহ-সৌধ-বৎ বিকৃত হইয়া উঠে। যখন তাঁহার বাড়িতে নাচ, গান, যাত্রা পর্ব উপস্থিত হয়, তখন দলে-দলে মানুষ-কোকিল আসিয়া তাঁহার ঘর-বাড়ি আঁধার করিয়া তুলে—কেহ খায়, কেহ গায়, কেহ কাশে, কেহ তামাক পোড়ায়, কেহ হাসিয়া বেড়ায়, কেহ মাত্রা চড়ায়, কেহ টেবিলের নিচে গড়ায়। যখন নসীবাবু বাগানে যান, তখন মানুষ-কোকিল তাঁহার সঙ্গে পিপীড়ার সারি দেয়। আর, যে-রাত্রে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল, আর নসীবাবুর পুত্রটির অকালে মৃত্যু হইল, তখন তিনি একটি লোক পাইলেন না। কাহারও অসুখ, এ-জন্য আসিতে পারিলেন না; কাহারও বড় সুখ—একটি নাতি হইয়াছে, এ-জন্য আসিতে পারিলেন না। কাহারও সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, এ-জন্য আসিতে পারিলেন না; কেহ সমস্ত রাত্রি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, এ-জন্য আসিতে পারিলেন না। আসল কথা, সেদিন বর্ষা, বসন্ত নহে, বসন্তের কোকিল সেদিন আসিবে কেন?

তা ভাই, বসন্তের কোকিল, তোমার দোষ নাই, তুমি ডাক। ওই অশোকের ডালে বসিয়া রাঙা ফুলের রাশির মধ্যে কালো শরীর,

জ্বলন্ত আগুনের মধ্যগত কালো বেগুনের মত লুকাইয়া রাখিয়া, একবার তোমার ওই পঞ্চম স্বরে কু-উ বলিয়া ডাক। তোমার ওই কু-উ রবটি আমি বড় ভালবাসি। তুমি নিজে কালো, পরান্ন-প্রতিপালিত, তোমার চক্ষে সকলই 'কু'—তবে যত পার, ওই পঞ্চম স্বরে ডাকিয়া বল, 'কু-উ'। যখন এ পৃথিবীতে এমন কিছু সুন্দর সামগ্রী দেখিবে যে তাহাতে আমার দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষার উদয় হয়, তখনই উচ্চ ডালে বসিয়া ডাকিয়া বলিও, 'কু-উ'—কেন না, তুমি সৌন্দর্য-শূন্য, পরান্ন-প্রতিপালিত।

যখনই দেখিবে, লতা সন্ধ্যার বাতাস পাইয়া, উপর্যুপরি বিন্যস্ত পুষ্প-স্তবক লইয়া দুলিয়া উঠিল, অমনি সুগন্ধের তরঙ্গ ছুটিল—তখনই ডাকিয়া বলিও, 'কু-উঃ'।

যখনই দেখিবে, অসংখ্য গন্ধরাজ এক-কালে ফুটিয়া আপনাদিগের গন্ধে আপনারা বিভোর, এ-উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে, তখনই তোমার সেই ডাল হইতে ডাকিয়া বলিও, 'কু-উঃ'। যখন দেখিবে, বকুলের অতি ঘনবিন্যস্ত মধুর-শ্যামল স্নিগ্ধোজ্জ্বল পত্র-রাশির শোভা আর গাছে ধরে না—পূর্ণ-যৌবনা সুন্দরীর লাবণ্যের ন্যায় হাসিয়া হাসিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া, হেলিয়া দুলিয়া, ভাঙিয়া গলিয়া, উছলিয়া উঠিতেছে, তাহার অসংখ্য প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধে আকাশ মাতিয়া উঠিতেছে—তখন তাহারই আশ্রয়ে বসিয়া, সেই পাতার স্পর্শে অঙ্গ শীতল করিয়া, সেই গন্ধে দেহ পবিত্র করিয়া, সেই বকুলকুঞ্জ হইতে ডাকিও, এ 'কু-উঃ'।

অনুশীলনী

□ বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১॥ 'তুমি বসন্তের কোকিল, শীত-বর্ষার কেহ নও।'—কোকিল সম্পর্কে লেখক এরকম কথা বলেছেন কেন?

২॥ 'যখন নসীবাবুর তালুকের খাজনা আসে'—এই 'নসীবাবুটি' কে? তাঁর তালুকের খাজনা এলে কি হয় তার একটি বর্ণনা দাও।

৩॥ 'সেদিন বর্ষা, বসন্ত নহে'—'বর্ষা' ও 'বসন্ত' বলতে লেখক কি বুঝিয়েছেন? 'সেদিনে'র অবস্থা বর্ণনা করো।

৪॥ 'তোমার চোখে সকলই 'কু'—লেখক এ-কথা বলেছেন কেন?

৫॥ লেখক 'বসন্তের কোকিল' রচনায় গন্ধরাজ, বকুল প্রভৃতি ফুলের সৌন্দর্যের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

□ আলোচনামূলক সংক্ষিপ্ত/মৌখিক প্রশ্ন :

১॥ 'মানুষ-কোকিল' বলতে লেখক কি বোঝাতে চেয়েছেন?

২॥ 'কাহারও অসুখ'—'অসুখ' কথাটির মধ্যে দুটি অর্থ আছে—কি কি?

৩॥ 'টিকি, ফোঁটা, তেড়ি, চশমার হাট' কথাগুলিকে কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে?

৪॥ 'হেটো ইংরেজী, মেটো ইংরেজী, চোরা ইংরেজী, ছেঁড়া ইংরেজী' কথাগুলো দিয়ে লেখক কি অর্থ বোঝাতে চেয়েছেন?

৫॥ 'পরান্ন-প্রতিপালিত' কথাটির অর্থ কি! কোকিলকে 'পরান্ন প্রতি-পালিত' বলার কারণ কি?

৬॥ কোকিল সৌন্দর্যের মধ্যে থেকে এবং সৌন্দর্য দেখেও তাকেই আবার কু বলে কেন?

৭॥ লেখক কোকিলের কোন্ জিনিসটি ভালোবাসেন?





প্রাচীন বাংলার থিয়েটার — হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

লেখক ঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের একজন মনস্বী ব্যক্তি, সুপণ্ডিত, বহুভাষাবিদ্, সুলেখক ও গবেষক। জন্ম ঃ ১৮৫৩; মৃত্যু ১৯৩১। জন্মস্থান ঃ ২৪-পরগনা জিলার নৈহাটি। ইনিই নেপাল থেকে প্রাচীন বাংলার নিদর্শন 'চর্যাপদে'র পুঁথি আবিষ্কার করেন। রচিত গ্রন্থ ঃ বাল্মীকির জয়, বেণের মেয়ে, প্রাচীন বাংলার গৌরব প্রভৃতি। □

মূল রচনা ঃ 'প্রাচীন বাংলার থিয়েটার' রচনাটি লেখকের 'প্রাচীন বাংলার গৌরব' গ্রন্থটি থেকে সঙ্কলিত। □

রচনা সম্পর্কে ঃ আমাদের দেশে এমনকি বাংলাদেশেও প্রাচীনকালে থিয়েটার ছিল। সেকালের থিয়েটার কেমন ছিল, কিভাবে মঞ্চগৃহ, মঞ্চ প্রভৃতি নির্মাণ করা হত, দর্শকেরা কোথায় বসত ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক তথ্য এই রচনাটিতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রাচীন কালের থিয়েটার সম্পর্কে অনেক কৌতূহলের নিরসন হয় এই রচনাটি পড়লে। হরপ্রসাদ পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। দুরূহ, গুরুতর বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু এত সহজ তাঁর লেখার ছাঁদ যে বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না। রচনারীতি, বাক্যগঠন সবই অত্যন্ত সহজ অথচ সুন্দর। □

প্রাচীন বাংলার পঞ্চম গৌরব থিয়েটার। থিয়েটারের সেকালের নাম 'প্রেক্ষাগৃহ' বা 'পেক্‌খা ঘরঅ'। ইউরোপের অনেক পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষে থিয়েটার ছিল না। থিয়েটারের

ব্যাপার গ্রীস হইতে এখানে আসিয়াছে, থিয়েটার রাজাদের নাচঘরে থাকিত। এ কথা একেবারে ঠিক নয়।

আমাদের শাস্ত্রে বলে, এক সময়ে দেবাসুরে ঘোর দ্বন্দ্ব হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে জিতিয়া ইন্দ্র এক ধ্বজা খাড়া করিয়া দেন। ধ্বজার নিচে দেবতার দল আমোদ-আহ্লাদ করিতে থাকেন। আমোদ করিতে করিতে তাঁহারা দেবাসুরের যুদ্ধ অভিনয় করিয়া বসিলেন। দেবতারা দেখিলেন যে, 'বা! ইহাতে ত বেশ আমোদ হয়। যখনই শক্রধ্বজ তুলা যাইবে, তখনই এইরকম অভিনয় করিতে হইবে।' অসুরেরা বলিল, 'বা! আমাদের ছোট করিবার জন্য তোমরা একটা নূতন কীর্তি করিবে, ইহা আমরা কিছুতেই হইতে দিব না।' এই বলিয়া তাহারা অভিনয় ভাঙিয়া দিবার যোগাড় করিয়া তুলিল। ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া এক বাঁশ লইয়া তাহাদিগকে তাড়া করিলেন। অসুর মারিতে মারিতে বাঁশের ডগাটি ছেঁচিয়া গেল, তাহার নাম হইল 'জর্জর'। জর্জর সেই অবধি নাটকের নিশান হইল। প্রেক্ষাগৃহ তৈয়ার করিতে গেলে আগে জর্জর পুঁতিতে হইত। নাটক আরম্ভ করিতে গেলে আগে জর্জরের পূজা করিতে হইত। জর্জরের ছয়টি পাব ছয় রকম নেকড়া দিয়া জড়ানো থাকিত। ছয় জন বড় বড় দেবতা উহাতে বাস করিতেন। তাঁহাদের ছয় জনেরই পূজা করিতে হইত।

থিয়েটারের ঘর তিন রকম হইত। এক রকম টানা, অর্থাৎ আগা সরু, গোড়া সরু, মাঝখানটা মোটা। ইহা একশো আট হাত লম্বা। এরূপ ঘর দেবস্থানেই হইত। আর একরূপ ঘর চৌকোনো—চৌষট্টি হাত লম্বা, বত্রিশ হাত চ্যাটাল। ইহা রাজাদের জন্য। আর সাধারণ ভদ্রলোকদের বাড়িতে যে থিয়েটার হইত তাহা তেকোনা, সমবাহু ত্রিভুজ। প্রত্যেক বাহুর পরিমাণ বত্রিশ হাত।

ঘর করিবার সময়ে ঠিক মাঝখানে জর্জর পুঁতিয়া রাখিতে হইত। থিয়েটারের অর্ধেকটা প্রেক্ষকদিগের জন্য, অর্ধেকটা নটদিগের জন্য। থিয়েটারও দোতলা হইত, প্রেক্ষকদিগের জায়গাও দোতলা হইত। দোতলা স্টেজ (রঙ্গ) পৃথিবীর আর কোন দেশে এখনও নাই।

পৃথিবীর ব্যাপার একতলায় হইত। স্বর্গের ব্যাপার দোতলায় হইত। প্রেক্ষকদিগের যে অর্ধেকটা স্থান থাকিত, তাহার সম্মুখটা ব্রাহ্মণদের জন্য, সেখানকার থাম সাদা। তাহার পিছনে ক্ষত্রিয়দের স্থান। সেখানকার থামগুলি রাঙা। তাহার পিছনে বৈশ্যের ও শূদ্রের অর্ধেক অর্ধেক করিয়া স্থান, সেখানকার থাম কালো ও হলদে। সম্মুখের সারির অপেক্ষা পিছনের সারি এক হাত উঁচা—এইরূপে গেলারি করা ছিল। দোতলার অবস্থাও এইরূপ।

স্টেজের পিছনে সাজঘর ও বাজনার ঘর, তাহার পিছনে বিশ্রাম ঘর, তাহারও পিছনে দেবতাদের পূজা করিবার স্থান। স্টেজে চিত্র থাকিত, কিন্তু সেগুলি নড়ানো যাইত না। স্টেজের দেওয়ালের গায়ে উজ্জ্বল বর্ণে কোথাও বাগান, কোথাও বাড়ি, কোথাও শোবার ঘর, কোথাও নদীতীর, কোথাও পর্বত আঁকা থাকিত। স্টেজের উপরে জর্জরের পূজা হইত ও নান্দীপাঠ হইত। স্টেজের দুই পাশে দুই দরজা থাকিত, সেইখান দিয়া পাত্রের প্রবেশ হইত।

অনুশীলনী

☐ **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**

১॥ 'একথা একেবারে ঠিক নয়।'—কোন্ কথা একেবারে ঠিক নয়? কেন নয়?

২॥ কিভাবে অভিনয়ের সূচনা হয়েছিল?

৩॥ 'জর্জর' সম্পর্কে কি জানো, লেখো। প্রেক্ষাগৃহে জর্জর থাকত কেন?

৪॥ 'থিয়েটারের ঘর তিন রকম হইত।'—এই তিন রকম থিয়েটার ঘর সম্পর্কে যা জানো লেখো।

৫॥ সেকালের থিয়েটার ঘরের বর্ণনা দাও এবং প্রেক্ষক বা দর্শকদের বসার ব্যবস্থা, রঙ্গমঞ্চের সাজসজ্জা ইত্যাদি সম্পর্কে নিজের ভাষায় লেখো।

৬॥ স্টেজ, স্টেজের সামনে ও পিছনে কি কি থাকত তার বর্ণনা দাও।

৭॥ দেবাসুরের দ্বন্দ্বের কাহিনীটি গুছিয়ে লেখো।

□ আলোচনামূলক সংক্ষিপ্ত / মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১ ।। থিয়েটারের সেকালের নাম কি ছিল ?

২ ।। 'ধ্বজা' কি ?

৩ ।। 'জর্জর সেই অবধি নাটকের নিশান হইল।'—জর্জর কি ? নাটকের নিশান বলতে কি বোঝানো হয়েছে ?

৪ ।। সেকালে ক-তলা স্টেজ হত ? একতলায় এবং দোতলায় কি হত ?

৫ ।। প্রেক্ষকরা কে কোথায় বসতেন ?

৬ ।। স্টেজের পিছনে কি থাকত ?

৭ ।। স্টেজে কি থাকত ?





লেখক : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি-সার্বভৌম, জাতীয় কবি, কবিগুরু। জন্ম : ৭ই মে, ১৮৬১ ; মৃত্যু : ৭ই আগস্ট, ১৯৪১। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ; পিতামহ দ্বারকানাথ। জন্মস্থান : কলকাতার জোড়াসাঁকো। প্রথাগত স্কুল-কলেজের পাঠ না নিয়েও অসামান্য প্রতিভা ও মনীষার অধিকারী। কাব্য-কবিতা, গল্প-উপন্যাস, নাটক, দিনলিপি, ভ্রমণকাহিনী, প্রহসন, গান প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্যবিস্তার ও বিরল অলৌকিক শক্তির বিকাশ। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কারলাভ ও বিশ্বস্বীকৃতি। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা। বহু গ্রন্থের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ। সেইসব গ্রন্থের তালিকা দীর্ঘ। শিক্ষার্থীরা অনেক গ্রন্থেরই নাম জানে। বড়ো হয়ে আরো জানবে। কেননা, রবীন্দ্র-সাহিত্য অসীম সমুদ্রবিশেষ। □

মূল রচনা : 'নতুন বউ' রচনাংশটি রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' থেকে নেওয়া হয়েছে। □

রচনা সম্পর্কে : রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনের পরিচয় এবং ঘটনা জানতে হলে, তাঁর আত্মজীবনীমূলক লেখা বই 'জীবনস্মৃতি ও 'ছেলেবেলা' অবশ্যই পড়তে হবে। 'ছেলেবেলা' রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের লেখা। এইসময় কবি গদ্য-পদ্যের সব সীমানা ভেঙে এক আশ্চর্য ভাষাশৈলীর অধিকারী হয়েছেন। এ ভাষা যেন ছন্দোবদ্ধ গদ্য—গদ্যকবিতা। বিশ্বকবির ছেলেবেলার জীবন সম্পর্কে জানার কত কৌতূহলই তো আমাদের হয়। 'ছেলেবেলা'

পড়লে সেই কৌতূহলই অনেকখানিই নিবৃত্ত হয়। 'নতুন বউ' অংশটিতে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী কাদম্বরী দেবীর কথা বলা হয়েছে। তিনি বাড়িতে নতুন বউ হয়ে এলে কি ঘটেছিল কবির জীবনে তারই কৌতুকপ্রদ কাহিনী এখানে উদ্ধৃত হয়েছে। এমন সুন্দর ঝরঝরে, ছন্দোবদ্ধ ভাষা এর আগে রবীন্দ্রনাথ আর কখনো লেখেন নি। কবির এ এক আশ্চর্য ভাষাসিদ্ধি। □

এমন সময় একদিন বাজল সানাই বারোয়াঁ সুরে। বাড়িতে এল নতুন বউ, কচি শামলা হাতে সরু সোনার চুড়ি। পলক ফেলতেই ফাঁক হয়ে গেল বেড়া, দেখা দিল চেনাশোনার বাহির সীমানা থেকে মায়াবী দেশের নতুন মানুষ। দূরে দূরে ঘুরে বেড়াই, সাহস হয় না কাছে আসতে। ও এসে বসেছে আদরের আসনে, আমি যে হেলা-ফেলার ছেলেমানুষ।

তুই মহলে বাড়ি তখন ভাগ করা। পুরুষরা থাকে বাইরে, মেয়েরা ভিতর-কোঠায়। নবাবি কায়দা তখনো চলে আসছে। মনে আছে, দিদি বেড়াচ্ছিলেন ছাদের উপর নতুন বউকে পাশে নিয়ে, মনের কথা বলাবলি চলছিল। আমি কাছে যাবার চেষ্টা করতেই এক ধমক। এপাড়া যে ছেলেদের দাগ-কাটা গণ্ডির বাইরের। আবার শুকনো মুখ করে ফিরতে হবে সেই ছ্যাৎলা-পড়া পুরোনো দিনের আড়ালে।

হঠাৎ দূর পাহাড় থেকে বর্ষার জল নেমে সাবেক বাঁধের তলা খইয়ে দেয়, এবার তাই ঘটল।—বাড়িতে নতুন আইন চালালেন কর্ত্রী। বউঠাকরুনের জায়গা হল বাড়ি-ভিতরের ছাদের লাগাও ঘরে। সেই ছাদে তাঁরই হল পুরো দখল। পুতুলের বিয়েতে ভোজের পাত পড়ল সেইখানে। নেমন্তন্নের দিনে প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠত এই ছেলেমানুষ। বউঠাকরুন রাঁধতে পারতেন ভালো, খাওয়াতে ভালোবাসতেন; এই খাওয়াবার শখ মেটাতে আমাকে হাজির পেতেন। ইস্কুল থেকে ফিরে এলেই তৈরি থাকত তাঁর আপন হাতের প্রসাদ। চিংড়িমাছের চচ্চড়ির সঙ্গে পান্‌তা ভাত যেদিন মেখে দিতেন অল্প একটু লঙ্কার আভাস দিয়ে, সেদিন আর কথা ছিল না। মাঝে

মাঝে যখন আত্মীয়-বাড়িতে যেতেন, ঘরের সামনে তাঁর চটি-জুতো-জোড়া দেখতে পেতুম না, তখন রাগ করে ঘরের থেকে একটা-কোনো দামী জিনিস লুকিয়ে রেখে ঝগড়ার পত্তন করতুম। বলতে হত, 'তুমি গেলে তোমার ঘর সামলাবে কে ? আমি কি চৌকিদার !'

তিনি রাগ দেখিয়ে বলতেন, 'তোমাকে আর ঘর সামলাতে হবে না, নিজের হাত সামলিয়ো।'

এ কালের মেয়েদের হাসি পাবে; তাঁরা বলবেন, নিজের ছাড়া সংসারে কি পরের দেওর ছিল না কোনোখানে ? কথাটা মানি। এখনকার কালের বয়স সকল দিকেই তখনকার থেকে হঠাৎ অনেক বেড়ে গিয়েছে। তখন বড়ো ছোটো সবাই ছিল ছেলেমানুষ।

অনুশীলনী

□ বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১ ॥ নতুন বউ কি বেশে এলেন ? তাঁকে দেখে লেখকের কি মনে হয়েছিল ? তিনি তাঁকে দেখে দূরে দূরে ঘুরে বেড়াতেন কেন ?

২ ॥ 'আমি কাছে যাবার চেষ্টা করতেই এক ধমক।' কে, কাদের কাছে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। ধমক কেন ?

৩ ॥ 'বাড়িতে নতুন আইন চালালেন কর্ত্রী।' এই 'কর্ত্রীটি' কে ? তিনি কি নতুন আইন চালালেন ?

৪ ॥ 'নেমন্তন্নের দিনে প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠত এই ছেলেমানুষ।'—কিসের নেমন্তন্ন ? 'প্রধান ব্যক্তি' কথার অর্থ কি ? 'ছেলেমানুষটি' কে ?

৫ ॥ 'সেদিন আর কথা ছিল না।'—কোন্ দিনের কথা বলছেন লেখক ?

৬ ॥ 'তুমি গেলে তোমার ঘর সামলাবে কে ? আমি কি চৌকিদার !'—কে, কাকে এ-কথা বলতেন ? তিনি ঘর-সামলানোর কথা বলে কি বোঝাতে চাইতেন ?

৭ ॥ 'তোমাকে আর ঘর সামলাতে হবে না, নিজের হাত সামলিয়ো।'—এ-কথা কে বলতেন, কাকে বলতেন ? তাঁর বক্তব্যের অর্থ কি ?

☐ আলোচনামূলক সংক্ষিপ্ত/মৌখিক প্রশ্ন :

১ ॥ একদিন কি সুরে সানাই বাজল ?

২ ॥ 'মায়াবী দেশের নতুন মানুষটি' কে ? তাঁকে ওরকম বলা হয়েছে কেন ?

৩ ॥ 'নবাবি কায়দা তখনো চলে আসছে।'—এখানে কোন্ নবাবি কায়দার উল্লেখ করা হয়েছে ?

৪ ॥ 'তাঁর আপন হাতের প্রসাদ।'—কার ? 'প্রসাদটি' কি ?

৫ ॥ 'ঝগড়ার পত্তন করতুম'—কে, কেন করতেন ?

৬ ॥ 'এ কালের মেয়েদের হাসি পাবে'।—কেন ?

৭ ॥ 'তখন বড়ো-ছোট সবাই ছিল ছেলেমানুষ।'—কথাগুলো দিয়ে লেখক কি বোঝাতে চেয়েছেন ?





চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত - দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

লেখক ঃ বাংলা নাট্যসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৯ জুলাই, ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন ; ১৭ মে, ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা কৃষ্ণনগরের দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরেজিতে এম. এ. পাস করে দ্বিজেন্দ্রলাল বিলেত যান। শিক্ষা শেষ করে দেশে ফিরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যভার গ্রহণ করেন। সেকালে বাংলা নাট্যজগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অচ্ছেদ্য। তিনি পৌরাণিক ঐতিহাসিক সামাজিক নাটক ও প্রহসনে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন। গান রচনা, বিশেষত হাসির গান রচনা এবং ব্যঙ্গাত্মক গান ও কবিতা রচনার জন্য তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর রচিত নাট্যগ্রন্থের মধ্যে সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, নূরজাহান, মেবারপতন, দুর্গাদাস, ভীষ্ম, সীতা, প্রতাপসিংহ প্রভৃতি বিখ্যাত ; তাঁর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আর্যগাথা, আষাঢ়ে, মন্দ্র, আলেখ্য, হাসির গান প্রভৃতি বিশেষ উল্লেযোগ্য।□

মূল রচনা ঃ 'চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত' নাট্যাংশটি দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক থেকে নেওয়া হয়েছে। □

রচনা-সম্পর্কে ঃ সেকালের বাংলা নাট্যসাহিত্য ও নাট্যমঞ্চের প্রবাদপুরুষ দ্বিজেন্দ্রলাল। একালেও তাঁর সমকক্ষ নাট্যপ্রতিভা বিরল। বিশেষত ঐতিহাসিক নাটকে তিনি প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। 'চন্দ্রগুপ্ত' একটি ঐতিহাসিক নাটক। মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা, মহারাজ পদ্মের দাসী মুরার পুত্র চন্দ্রগুপ্ত কিভাবে তক্ষশিলার সুচতুর কূটবুদ্ধি ব্রাহ্মণ চাণক্যের

সহায়তায় মহারাজ নন্দকে পরাজিত ও নিহত করে রাজসিংহাসনলাভ ও মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এই নাটকে তা-ই বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার, সেলুকস, চন্দ্রগুপ্ত ও সেলুকসের বিরোধ, যুদ্ধে সেলুকসের পরাজয়, সেলুকসকন্যা হেলেনের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ও এই নাটকের অন্তর্ভূক্ত। এই অংশে চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত—গুরু ও শিষ্যের প্রথম সাক্ষাৎকার বর্ণনা করা হয়েছে। □

[চাণক্যের প্রবেশ]

চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য উভয়ে সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়া পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শেষে চন্দ্রগুপ্ত নতজানু হইয়া প্রণাম করিলেন।

চাণক্য। তুমি চন্দ্রগুপ্ত ?

চন্দ্রগুপ্ত। আপনার দাস।

চাণক্য। (আপাদমস্তক চন্দ্রগুপ্তকে নিরীক্ষণ করিয়া) তুমি পার্বে।

চন্দ্রগুপ্ত। যদি আপনার কৃপা থাকে।

চাণক্য। আমি কে ? কেউ না। তুমি একাই পার্বে। আমি কে ? দীন ব্রাহ্মণ ! অতি দীন !

চন্দ্রগুপ্ত। দীন ব্রাহ্মণ !

চাণক্য। আজ ব্রাহ্মণের মত দীন কে ? তার শাপে সগরবংশ ভস্ম হওয়া দূরে থাকুক, প্রদীপটি পর্যন্ত জ্বলে না। তার উপবীত আজ ভিক্ষুকের চিহ্ন, তাকে ক্ষত্রিয় আজ পদাঘাত করে চলে যায়।

[চন্দ্রগুপ্ত স্তব্ধ রহিলেন]

মাঝে মাঝে সমুদ্রের তরঙ্গ তুলে ধেয়ে আসি, কিন্তু তীরে বাধা পেয়ে গভীর হতাশ্বাসে ফিরে যাই। কোন শক্তি নাই ! কোন শক্তি নাই !

চন্দ্রগুপ্ত। সে কি ! শুনেছি চাণক্য পণ্ডিত—

চাণক্য। বিচক্ষণ, বিদ্বান, কূট। না ?—ঠিক শুনেছিলে, কেবল একটা কথা শোন নাই। শোন নাই যে, তার হৃদয় নাই। আমার

মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছে। এ বক্ষ (সহসা চন্দ্রগুপ্তের হস্ত টানিয়া নিজের বক্ষের উপর রাখিয়া)—এই বক্ষে হাত দিয়ে দেখ! কি দেখছ?

চন্দ্রগুপ্ত। ক্ষীণ রক্তস্রোত বৈছে।

চাণক্য। কিসের স্রোত?

চন্দ্রগুপ্ত। রক্তস্রোত।

চাণক্য। মূর্খ! নাই—এদেহে রক্ত নাই! এ হিমানী প্রবাহ! রক্ত যা ছিল জমাট হয়ে গিয়েছে।

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেব! আমি সব শুনেছি। আমায় শুদ্ধ আজ্ঞা দিউন। আমায় শুদ্ধ আশীর্বাদ করুন। আমায় শুদ্ধ বলুন—চন্দ্রগুপ্ত! তুমি অগ্রসর হও, আর কিছু চাই না। আর সব আমি কর্ব।

চাণক্য। পার্বে?

চন্দ্রগুপ্ত। পার্ব। গুরুদেব! সেকেন্দার শাহার এই ভবিষ্যদ্বাণী যে আমি দিগ্বিজয়ী বীর হব। সেই আশ্বাসবাণী নিদ্রায় ও জাগরণে আমার কর্ণে এখনও বাজছে। আমি পার্ব। শুদ্ধ আপনি আমার মহাযজ্ঞের পুরোহিত হোন! আমায় আপনি এই ব্রতে দীক্ষিত করুন!

চাণক্য। কি? তুমি কি আজ্ঞা কর্ছ প্রাণেশ্বরি!

চন্দ্রগুপ্ত। এ কি আবার!

চাণক্য। তোমার আজ্ঞা! উত্তম! (চন্দ্রগুপ্তকে) তবে পা ছুঁয়ে শপথ কর যে, এই ব্রাহ্মণের আদেশ তুমি সর্বথা পালন করবে।

চন্দ্রগুপ্ত। (চাণক্যের চরণ স্পর্শ করিয়া) শপথ কর্ছি গুরুদেব! আপনি আমায় দীক্ষা দিউন।

চাণক্য। হাঁ তুমি পার্বে। তোমার মুখ, তোমার দৃষ্টি, তোমার ভঙ্গিমা সমস্বরে বল্ছে যে তুমি পার্বে। হাঁ, আমি তোমায় দীক্ষা দেব। তোমায় মগধের সিংহাসনে বসাব। তোমায় ভারতের অধীশ্বর কর্ব। তবে ইন্ধন প্রস্তুত কর চন্দ্রগুপ্ত! আমি তাকে

ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত কর্ব। সেই অগ্নি দাবানলের ন্যায় ব্যাপ্ত হবে। সমস্ত ভারতবর্ষ জ্বলে উঠবে! চন্দ্রগুপ্ত!

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেব!

চাণক্য। উর্দ্ধে চাও দেখি।—কি দেখছো?

চন্দ্রগুপ্ত। আকাশ।

চাণক্য। কি বর্ণ?

চন্দ্রগুপ্ত। পাংশুরক্তবর্ণ।

চাণক্য। কি বুঝছো?

চন্দ্রগুপ্ত। ঝড় উঠবে।

চাণক্য। ঠিক! ঝড় উঠবে। আর সম্মুখ ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখ দেখি! কিছু দেখতে পাচ্ছ না?

চন্দ্রগুপ্ত। না!

চাণক্য। অন্ধ! সেখানেও একটা ঝড় উঠবে!—এ কপিলের অভিশাপ নয়, বিশ্বামিত্রের তপোবন নয়, পরশুরামের শৌর্য নয়, বামনের ছলনা নয়। এ ব্রাহ্মণের বুদ্ধি আর শূদ্রের নিষ্ঠা, ব্রাহ্মণের সাধনা আর শূদ্রের প্রতিহিংসা, ব্রাহ্মণের তেজ আর শূদ্রের শক্তি! স্বর্গমর্ত্য একসঙ্গে! আর ভয় নাই চন্দ্রগুপ্ত। ওঠো—আমি আমার চক্ষুর সম্মুখে কি দেখ্‌ছি জানো?

চন্দ্রগুপ্ত। কি গুরুদেব?

চাণক্য। এই প্রধূমিতা প্রজ্বলিতা প্রবাহিতা রক্তস্রোতস্বতী ভৈরবী ভারতভূমির পরিবর্তে এক রত্নালঙ্কারা, পুষ্পোজ্জ্বলা, সঙ্গীত-মুখরা, হাস্যময়ী জননী। জলধি হতে জলধি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এক মহাসাম্রাজ্য! সেই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তুমি আর তার পুরোহিত এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ চাণক্য!

অনুশীলনী

□ বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১ ॥ 'আজ ব্রাহ্মণের মত দীন কে? তার শাপে সগরবংশ ধ্বংস হওয়া দূরে থাকুক, প্রদীপটি পর্যন্ত জ্বলে না।'—এ-কথা কে, কাকে বলেছেন? ব্রাহ্মণকে বক্তা 'দীন' বলে কি বোঝাতে চেয়েছেন? সগরবংশ ধ্বংসের কাহিনীটি কি?

২ ॥ 'সেকেন্দার শাহার এই ভবিষ্যদ্বাণী যে, আমি দিগ্বিজয়ী বীর হব।'—কে, কাকে এ কথা বলেছেন? সেকেন্দার শাহা কে? তিনি বক্তাকে কবে কোথায় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন?

৩ ॥ 'তবে ইন্ধন প্রস্তুত কর চন্দ্রগুপ্ত। আমি তাকে ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত করব।'—কে, কাকে এ-কথা বলেছেন? বক্তার কথাগুলির অর্থ কি?

৪ ॥ 'এ ব্রাহ্মণের বুদ্ধি আর শূদ্রের নিষ্ঠা'—'ব্রাহ্মণের বুদ্ধি' বলতে বক্তা কি বুঝিয়েছেন? শূদ্রটি কে?

□ আলোচনমূলক সংক্ষিপ্ত/মৌখিক প্রশ্ন :

১ ॥ 'তার উপবীত আজ ভিক্ষুকের চিহ্ন'।—'তার'—কার? উপবীত কি? উপবীত ভিক্ষুকের চিহ্ন এ-কথা বলার কারণ কি!

২ ॥ 'তোমায় মগধের সিংহাসনে বসাব।'—কে, কাকে মগধের সিংহাসনে বসাতে চান? মগধের সিংহাসনে তখন কে ছিলেন?

৩ ॥ 'সেই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তুমি আর তার পুরোহিত এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ চাণক্য।'—এই প্রতিষ্ঠাতা' ও 'পুরোহিত কে কে?



সমুদ্র পথে -স্বামী বিবেকানন্দ

লেখক : স্বামী বিবেকানন্দ, যাঁর প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার সিমুলিরায় জন্মগ্রহণ করেন ; ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে লোকান্তরিত হন। যৌবনেই ঈশ্বরসন্ধানী হয়ে ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে শিকাগো শহরে বিশ্বধর্মমহাসম্মেলনে যোগ-দান করে প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন। রামকৃষ্ণের আদর্শ প্রচারের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন ও বেলুড় মঠ স্থাপন করেন। বাংলা গদ্যসাহিত্যে তাঁর অবদান প্রচুর। রচিত গ্রন্থ : পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ভাববার কথা, বর্তমান ভারত প্রভৃতি। □

মূল রচনা : 'সমুদ্রপথে' গদ্যরচনাটি স্বামী বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। □

রচনা-সম্পর্কে : বিবেকানন্দ আধ্যাত্ম-জগতের মানুষ হলেও স্বদেশ ও স্বদেশের মানুষের সর্বপ্রকার বন্ধন মুক্তি ও প্রগতির জন্যই আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। তিনি সাহিত্যসৃষ্টির প্রসারে লেখনী ধারণ করেন নি। কিন্তু নানা সময়ে তিনি যেসব রচনা লিখেছেন তাদের সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থটি তাঁর দিনলিপির সংকলন। আমেরিকা যাত্রাকালে পত্রাকারে তিনি যা লিখে পাঠাতেন তা 'উদ্বোধন' মাসিকপত্রে প্রকাশিত হত। সেই রচনাগুলিই 'পরিব্রাজক' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ লাভ করে। বাংলা চলিত গদ্যের বিকাশে বিবেকানন্দের অবদান যে কত তা তাঁর এই একটি গ্রন্থ পড়লেই অনুমান করা যায়। আলোচ্য পাঠ্যাংশে

সমুদ্রপথে ভ্রমণের একটি জীবন্ত বর্ণনা একেবারে মুখের ভাষায় তিনি বর্ণনা করেছেন। □

পঁচিশে জুন (জ্যৈষ্ঠ) প্রাতঃকালে জাহাজ কলম্বো ছাড়লো। এবার ভরা মনসুনের মধ্যে দিয়ে গমন। জাহাজ যত এগিয়ে যাচ্ছে ঝড় ততই বাড়চে, বাতাস ততই বিকট নিনাদ করচে—অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, অন্ধকার।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ গর্জে গর্জে জাহাজের উপর এসে পড়চে, ডেকের উপর তিষ্ঠুন দায়। খাবার টেবিলের উপর আড়ে লম্বায় কাঠ দিয়ে চৌকো চৌকো খুপরি করে দিয়েছে, তার নাম ফিডল। তার উপর দিয়ে খাবারদাবার লাফিয়ে উঠ্‌চে। জাহাজ ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ কোরে উঠ্‌চে, যেন বা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। কাপ্তেন বলচেন, "তাইত, এবারকার মনসুনটা ত' ভারি বিট্‌কেল!" কাপ্তেনটি বেশ লোক; চীন ও ভারতবর্ষের নিকটবর্তী সমুদ্রে অনেক দিন কাটিয়েছেন, আমুদে লোক; আষাঢে গল্প করতে ভারি মজবুত। আর কি করা যায়; লেখাপড়া, এ ঢুলুনির চোটে মুশকিল। কেবিনের ভিতর বসা দায়; জানালাটা এঁটে দিয়েছি ঢেউয়ের ভয়ে, উপরে, সে ওহল পাছলের ধুম কি!

ভাগ্যিস্ সুখ দুঃখ কিছুই অনন্ত নয়, তাই ছয় দিনের পথ চৌদ্দ দিন কোরে, দিনরাত বিষম ঝড় বাদলের মধ্যে দিয়েও শেষটা এডেনে পেঁছে গেলুম। কলম্বো থেকে যত এগুনো যায়, ততই বাতাসের জোর, ততই ঢেউ—সে বাতাস সে ঢেউ ঠেলে কি জাহাজ চলে? জাহাজের গতি আদ্দেক হয়ে গেল—সকোত্রা দ্বীপের কাছাকাছি গিয়ে বেজায় বাড়লো। কাপ্তেন বল্লেন, "এইখানটা মনসুনের কেন্দ্র; এইটা পেরুতে পারলেই ক্রমে ঠাণ্ডা সমুদ্র।" তাই হলো, এ দুঃস্বপ্নও কাটলো।

৮ই সন্ধ্যাকালে এডেন। কাউকে নামতে দেবে না। কোনও জিনিস ওঠাতে দেবে না। দেখবার জিনিসও বড় নেই। কেবল ধুধু বালি,—রাজপুতনার ভাব—বৃক্ষহীন তৃণহীন পাহাড়, পাহাড়ের

ভেতরে ভেতরে কেল্লা, ওপরে পল্টনের ব্যারাক। সামনে অর্ধচন্দ্রাকৃতি হোটেল, আর দোকানগুলি জাহাজ থেকে দেখা যাচ্ছে। অনেকগুলি জাহাজ দাঁড়িয়ে। একখানি ইংরেজী যুদ্ধ জাহাজ, একখানি জার্মান এলো; বাকিগুলি মালের বা যাত্রীর জাহাজ। গেলবারে এডেন দেখা আছে। পাহাড়ের পেছনে দিশি পল্টনের ছাউনি, বাজার। সেখান থেকে মাইল কতক গিয়ে পাহাড়ের গায়ে বড় বড় গহ্বর তৈয়ারি করা, তাতে বৃষ্টির জল জমে। পূর্বে ঐ জলই ছিল ভরসা। এখন যন্ত্রযোগে সমুদ্রজল বাষ্প কোরে, আবার জমিয়ে, পরিষ্কার জল হচ্ছে, তা কিন্তু মাগ্‌গি। এডেন ভারতবর্ষেরই একটি শহর যেন— দিশি ফৌজ, দিশি লোক অনেক। পার্‌সি দোকানদার, সিন্ধি ব্যাপারী অনেক।

জাহাজ ক্রমেই উত্তরে চলেচে। এই রেড্‌-সির কিনার—প্রাচীন সভ্যতার মহাকেন্দ্র। ঐ ওপারে আরবের মরুভূমি; এপারে মিশর। এই—সেই প্রাচীন মিশর,……এদের আশ্চর্য শক্তিবিস্তার, রাজ্য-বিস্তার, সভ্যতাবিস্তার। যবনেরা এদের শিষ্য। এদের বাদ্‌শাহের পিরামিড নামক আশ্চর্য সমাধি মন্দির, নারীসিংহী মূর্তি এদের মৃত-দেহগুলি আজও বিদ্যমান।

১৪ই জুলাই রেড-সি পার হয়ে জাহাজ সুয়েজ পৌঁছুল। সামনে সুয়েজ খাল। জাহাজে সুয়েজে নামাবার মাল আছে, তার উপর এসেচেন মিশরে প্লেগ, আর আমরা আনচি প্লেগ—সম্ভবতঃ—কাজেই চোতরঙা ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়।…মাল নামবে, কিন্তু সুয়েজের কুলি জাহাজ ছুঁতে পারবে না। জাহাজে খালাসী বেচারাদের আপদ আর কি! তারাই কুলি হয়ে ক্রেনে কোরে মাল তুলে আলপট্‌কা নীচে সুয়েজী নৌকায় ফেলচে—তারা নিয়ে ডাঙ্গায় যাচ্চে।

জলে অসংখ্য মাছ আর হাঙ্গর ভেসে বেড়াচ্চে। এই বন্দরে আর অষ্ট্রেলিয়ার সিড্‌নী বন্দরে যত হাঙ্গর, এমন আর দুনিয়ার কোথাও নেই —বাগে পেলেই মানুষকে খেয়েচে। জলে নাবে কে? সাপ ও হাঙ্গরের ওপর মানুষের জাতক্রোধ; মানুষও বাগে পেলে ওদের ছাড়ে না।…

এবার ভূমধ্যসাগর ! ভারতবর্ষের বাহিরে এমন স্মৃতিপূর্ণ স্থান আর নেই—এশিয়া, আফ্রিকা প্রাচীন সভ্যতার অবশেষ। এক জাতীয় রীতি-নীতি ও খাওয়াদাওয়া শেষ হল ; আর এক প্রকার আকৃতি-প্রকৃতি, আহার-বিহার, পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার আরম্ভ হল—ইউরোপ এল।

অনুশীলনী

□ বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১ ॥ 'তাই হলো, এ দুঃস্বপ্নও কাটলো'।—এ দুঃস্বপ্ন কি ? তা কিভাবে কাটলো ?

২ ॥ এডেনের বর্ণনা দাও।

৩ ॥ মিশরের প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে লেখক কি বলেছেন ?

৪ ॥ সুয়েজে যে ঘটনা ঘটেছিল তা বর্ণনা কর।

৫ ॥ প্রাচীন এশিয়া ও আফ্রিকার সভ্যতার সঙ্গে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভেদ কোথায় ?

□ আলোচনামূলক সংক্ষিপ্ত/মৌখিক প্রশ্ন ঃ

(ক) পিরামিড কাহাকে বলে ?

(খ) কলম্বো কোথায় অবস্থিত ?

(গ) ভূমধ্যসাগর কোথায় অবস্থিত ?



স্বামীজীর মহাসমাধি - ভগিনী নিবেদিতা

লেখিকা ঃ ভারবর্ষের সার্বিক কল্যাণ ও নারী প্রগতির লক্ষ্যে নিবেদিত-প্রাণা ভগিনী নিবেদিতা—বিবেকানন্দের কাছে দীক্ষা নেওয়ার আগে যিনি ছিলেন মিস মার্গারেট নোবেল ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর আয়ার-ল্যাণ্ডের একটি অখ্যাত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ১৩ নভেম্বর দার্জিলিঙে এই মহীয়সী নারীর তিরোধান হয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি এবং বিবিধ সেবাকার্যে নিবেদিতা আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারিণী নিবেদিতার সাহিত্য প্রতিভাও ছিল। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ : My master as I saw him. এছাড়াও তিনি অনেক রচনা লিখেছিলেন। □

মূল রচনা : 'স্বামিজীর মহাসমাধি' নিবেদিতা 'My master as I saw him' থেকে নেওয়া অনুদিত রচনা। □

রচনা-সম্পর্কে : স্বামী বিবেকানন্দের সেবাদর্শে উৎসর্গীকৃতা নিবেদিতা 'স্বামিজীর মহাসমাধি' রচনাংশে সামিজীর তিরোধান সময়ের এক করুণ ও মর্মস্পর্শী চিত্র অঙ্কন করেছেন। ভাষার মাধুর্য ও বর্ণনার উজ্জ্বলতায় মহামানবের মৃত্যুদৃশ্যটি যেন সজীব হয়ে উঠেছে। এ-ধরনের লেখা বাংলা সাহিত্যে বড়ো একটা পাওয়া যায় না। □

বুধবারে—সেদিন একাদশী—তিনি নিরম্বু উপবাস করিলেন এবং শিষ্যাকে নিজহাতে প্রাতঃকালীন আহারীয় দ্রব্যসকল পরিবেশন করিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক জিনিসটি—কাঁঠালের

বীচিসিদ্ধ, আলুসিদ্ধ, সাদাভাত এবং বরফ দিয়া ঠাণ্ডা করা দুধ—দিবার সময় তৎসম্বন্ধে কৌতুক সহকারে গল্প করিতে লাগিলেন। সর্বশেষে ভোজন সমাপ্ত হইলে তিনি নিজে হাতে জল ঢালিয়া দিলেন এবং তোয়ালে দিয়া হাত মুছাইয়া দিলেন।

স্বভাবতই শিষ্যা প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছিলেন, "স্বামিজী, এসব আমারই আপনার জন্য করা উচিত, আপনার আমার জন্য নয়।" কিন্তু তাঁহার উত্তর অতি বিস্ময়জনক গাম্ভীর্যপূর্ণ হইল—"ঈশা তাঁর শিষ্যগণের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।"

তদুত্তরে শিষ্যার মুখে আসিতেছিল—"কিন্তু সে তো শেষ সময়ে!" কিসে যেন কথাটাকে আটকাইয়া দিল,—তাহা আর বলা হইল না। ভালই হইয়াছিল। কারণ, এখানেও শেষ সময় সমাগত হইয়াছিল।

এই কয়দিন স্বামিজীর কথাবার্তা ও চালচলনে কোনো বিষাদ-গম্ভীর ভাব ছিল না। পাছে তিনি অতিরিক্ত ক্লান্তি বোধ করেন, তজ্জন্য আমরা বিশেষ চিন্তান্বিত থাকিতাম, এবং কথাবার্তা ইচ্ছাপূর্বক অতি লঘু বিষয় সকলেই নিবদ্ধ রাখা হইত। তাঁহার পালিত পশুগণ; তাঁহার বাগান, নানাবিধ পরীক্ষা, পুস্তক এবং দূরস্থিত বন্ধুবর্গ—এই সকলেরই প্রসঙ্গ হইত। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও আমরা ঐ সময়ে একটি জ্যোতির্ময় সত্তা অনুভব করিতাম—তাঁহার স্থূল দেহ যেন উহারই ছায়া বা প্রতীক মাত্র বলিয়া বোধ হইত। তথাপি কেহই, অত শীঘ্র সব শেষ হইয়া যাইবে, একথা বুঝিতে পারেন নাই—বিশেষত সেই ৪ঠা জুলাই শুক্রবারে—কারণ সেদিন তাঁহাকে, বহু বৎসর যাবৎ তিনি যেমন ছিলেন, তদপেক্ষা অধিক সুস্থ ও সবল দেখা গিয়াছিল, এবং তজ্জন্য ঐদিনটিকে বড় শুভদিন বলিয়াই মনে হইয়াছিল।

ঐদিন তিনি অনেক ঘণ্টাকাল রীতিমত ধ্যান করিয়াছিলেন। তৎপরে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটি সংস্কৃত ক্লাশ করিয়াছিলেন। শেষে মঠের ফটক হইতে দূরবর্তী বড় রাস্তা পর্যন্ত বেড়াইয়াও আসিয়াছিলেন।

যখন তিনি বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তখন সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজিতেছে। তিনি নিজের ঘরে গিয়া গঙ্গার দিকে মুখ ফিরিয়া

ধ্যান করিতে বসিলেন। ইহাই শেষ ধ্যান। তাঁহার গুরুদেব প্রথম হইতেই যে মুহূর্তের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন সেই মুহূর্ত এখন উপস্থিত হইয়াছিল। আধঘণ্টা কাটিয়া গেল; তৎপরে সেই ধ্যানরূপ পক্ষে ভর করিয়া তাঁহার আত্মা দেশকালের সীমা ছাড়াইয়া, যথা হইতে আর পুনরাবৃত্তি হয় না, সেই পরমধামে চলিয়া গেল। শরীর ভাঁজ-করা পোশাকের মত পৃথিবীতেই পড়িয়া রহিল।

অনুশীলনী

□ বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১ ॥ 'কারণ, এখানেও শেষ সময় সমাগত হইয়াছিল।'—এই 'শেষ সময়' কি? কার 'শেষ সময়'?

২ ॥ তিরোধানের দিন স্বামিজী শিষ্যাকে কিভাবে আপ্যায়িত করেছিলেন?

৩ ॥ 'এই কয়দিন স্বামিজীর কথাবার্তা ও চালচলনে কোন বিষাদ-গম্ভীর ভাব ছিল না।'—কোন্ কয়দিনের কথা বলা হয়েছে? এ কয়দিন তাঁর সঙ্গে লেখিকা এবং স্বামিজীর শিষ্য-শিষ্যাগণ কিরূপ আচরণ করতেন?

৪ ॥ 'বিশেষত সেই ৪ঠা জুলাই শুক্রবারে'—এই ৪ঠা জুলাই স্বামিজী কিভাবে অতিবাহিত করেন?

৫ ॥ 'ইহাই শেষ ধ্যান।' —এই শেষ ধ্যানের বর্ণনা দাও।

□ আলোচনামূলক সংক্ষিপ্ত/মৌখিক প্রশ্ন :

১ ॥ ঈশা কে? তিনি শিষ্যগণের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন কেন?

২ ॥ 'একটি জ্যোতির্ময় সত্তা অনুভব করিতাম—' অর্থ কি?

৩ ॥ 'তাঁহার গুরুদেব প্রথম হইতেই যে মুহূর্তের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন'— তাঁর গুরুদেব কে? তিনি কি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন?

৪ ॥ 'পরমধর্ম' কি?

৫ ॥ 'শরীর ভাঁজ-করা পোশাকের মত পৃথিবীতেই পড়িয়া রহিল।'— কথাগুলির অর্থ কি?



লেখক ঃ শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতীয় চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির প্রধান পথপ্রদর্শক, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী। ১৮৭১-এ কলকাতার জোড়াসাঁকো-ঠাকুরপরিবারে জন্ম;। মৃত্যু—১৯৫১-এর ডিসেম্বর। পিতা গুণেন্দ্রনাথ। সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের অবদান খুব অল্প নয়, বিশেষত তিনি শিশু-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক। রচিত গ্রন্থ ঃ শকুন্তলা, রাজকাহিনী, ক্ষীরের পুতুল, নালক প্রভৃতি। □

মূল রচনা ঃ 'দুর্বাসার অভিশাপ' গদ্যাংশটি অবনীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' বইটি থেকে নেওয়া হয়েছে। □

রচনা-সম্পর্কে ঃ অবনীন্দ্রনাথ শকুন্তলার গল্পটি সংগ্রহ করেছেন মহাকবি কালিদাসের অমর দৃশ্যকাব্য (নাটক) 'অভিজ্ঞানম্ শকুন্তলম্' থেকে। শকুন্তলার কাহিনীটি এমনিতেই খুব চিত্তাকর্ষক। আশ্রমবালিকা বনবাসিনী শকুন্তলার তপস্বিনী বেশে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে আশৈশব জীবনযাপন, দুষ্মন্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বিবাহ প্রভৃতি কাহিনী যুগ-যুগ ধরে পাঠকদের আনন্দ দিয়ে আসছে। অবনীন্দ্রনাথ সেই চিরপুরাতন চিরনূতন কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন এক আশ্চর্য যাদুকরের ভাষায়। এমন সহজ সরল বর্ণনানিপুণ চিত্রধর্মী ভাষা আর কোথাও দেখা যায় না। এই ভাষা ছাত্রছাত্রীদের মনে অবশ্যই রেখাপাত করবে। তাদের গদ্যশৈলী একটা নতুন মাত্রা লাভ করবে এই গদ্যভাষার প্রভাবে। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছিলেন—অবন-ঠাকুর ছবি লেখেন। গদ্যে ছবি আঁকার এমন নমুনা

বাংলা সাহিত্যে কেন, অন্য ভাষার সাহিত্যেও বেশি পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। □

রাজা রাজ্যে চলে গেলেন, আর শকুন্তলা সেই বনে দিন গুনতে লাগল।

যাবারসময় রাজা নিজের মোহর আংটি শকুন্তলাকে দিয়ে গেলেন, বলে গেলেন—'সুন্দরী, তুমি প্রতিদিন আমার নামের একটি করে অক্ষর পড়বে, নামও শেষ হবে আর বনপথে সোনার রথ তোমাকে নিতে আসবে।'

কিন্তু হায়, সোনার রথ কই এল ?···

কত দিন গেল ; কত রাত গেল ; দুষ্মন্ত নাম কতবার পড়া হয়ে গেল, তবু সোনার রথ কই এল ? হায়, হায়, সোনার সাজে সোনার রথ সেই যে গেল আর ফিরল না !

পৃথিবীর রাজা সোনার সিংহাসনে, আর বনের রাণী কুটির-দুয়ারে, দুইজনে দুইখানে।

রাজার শোকে শকুন্তলার মন ভেঙে পড়ল। কোথা রইল অতিথি-সেবা, কোথা রইল পোষা হরিণ, কোথা রইল সাধের নিকুঞ্জবনে প্রাণের দুই প্রিয়সখী ! শকুন্তলার মুখে হাসি নেই, চোখে ঘুম নেই ! রাজার ভাবনা নিয়ে কুটির-দুয়ারে পাষাণ-প্রতিমা বসে রইল।

রাজার রথ কেন এল না ?

কেন রাজা ভুলে রইলেন ?

রাজা রাজ্যে গেলে একদিন শকুন্তলা কুটির-দুয়ারে গালে হাত দিয়ে বসে বসে রাজার কথা ভাবছে—ভাবছে আর কাঁদছে, এমন সময় মহর্ষি দুর্বাসা দুয়ারে অতিথি এলেন, শকুন্তলা জানতেও পারলে না, ফিরেও দেখলে না। একে দুর্বাসা মহা-অভিমানী, একটুতেই মহা রাগ হয়, কথায় কথায় যাকে-তাকে ভস্ম করে ফেলেন, তার উপর শকুন্তলার এই অনাদর—তাঁকে প্রণাম করলে না, বসতে আসন দিলে না, পা ধোবার জল দিলে না।

দুর্বাসার সর্বাঙ্গে যেন আগুন ছুটল, রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন,

—'কী! অতিথির অপমান? পাপীয়সী, এই অভিসম্পাত করছি—যার জন্যে আমায় অপমান করলি সে যেন তোকে কিছুতেই না চিনতে পারে।'

হায়, শকুন্তলার কি তখন জ্ঞান ছিল—যে দেখবে কে এল, কে গেল! দুর্বাসার একটি কথাও তার কানে গেল না।

অনসূয়া প্রিয়ম্বদা দুই সখী উপবনে ফুল তুলছিল, ছুটে এসে দুর্বাসার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। কত সাধ্য-সাধনা করে, কত কাকুতি-মিনতি করে, কত হাতে-পায়ে ধরে দুর্বাসাকে শান্ত করলে।

শেষে এই শাপান্ত হল—'রাজা যাবার সময় শকুন্তলাকে যে আংটি দিয়ে গেছেন সেই আংটি যদি রাজাকে দেখাতে পারে তবেই রাজা শকুন্তলাকে চিনবেন; যতদিন সেই আংটি রাজার হাতে না-পড়বে ততদিন রাজা সব ভুলে থাকবেন।' দুর্বাসার অভিশাপে তাই পৃথিবীর রাজা সব ভুলে রইলেন। বনপথে সোনার রথ আর ফিরে এল না!

এদিকে দুর্বাসাও চলে গেলেন আর তাত কণ্বও তপোবনে ফিরে এলেন। সারা পৃথিবী খুঁজে শকুন্তলার বর মেলেনি। তিনি ফিরে এসে শুনলেন সারা পৃথিবীর রাজা বনে এসে তার গলায় মালা দিয়েছেন। তাত কণ্বের আনন্দের সীমা রইল না, তখনি শকুন্তলাকে রাজার কাছে পাঠাবার উদ্যোগ করতে লাগলেন। দুঃখে অভিমানে শকুন্তলা মাটিতে মিশে ছিল, তাকে কত আদর করলেন, কত আশীর্বাদ করলেন।

উপবনে দুই সখী যখন শুনলে শকুন্তলা শ্বশুরবাড়ি চলল, তখন তাদের আর আহ্লাদের সীমা রইল না।

প্রিয়ম্বদা কেশর ফুলের হার নিলে, অনসূয়া গন্ধ ফুলের তেল নিলে, দুই সখীতে শকুন্তলাকে সাজাতে বসল। তার মাথায় তেল দিলে, খোঁপায় ফুল দিলে, কপালে সিঁদুর দিলে, পায়ে আলতা দিলে, নতুন বাকল দিলে; তবু ত মন উঠল না! সখীরা এ কি বেশ করে দিলে? প্রিয়সখী শকুন্তলা পৃথিবীর রাণী, তার এই কি সাজ?—হাতে মৃণালের বালা, গলায় কেশরের মালা, খোঁপায় মল্লিকার ফুল, পরণে বাকল?

—হায়, হায়, মতির মালা কোথায় ? হীরের বালা কোথায় ? সোনার মল কোথায় ? পরণে শাড়ি কোথায় ?

বনের দেবতারা সখীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন।

বনের গাছ থেকে সোনার শাড়ি উড়ে পড়ল, হাতের বালা খসে পড়ল, মতির মালা ঝরে পড়ল, পায়ের মল বেজে পড়ল। বনদেবতারা পলকে বনবাসিনী শকুন্তলাকে রাজেশ্বরী মহারানীর সাজে সাজিয়ে দিলেন।

তারপর যাবার সময় হল। হায়, যেতে কি পা সরে, মন কি চায় ?

এদিকে শুভলগ্ন বয়ে যায়, ওদিকে বিদায় আর শেষ হয় না। কুঞ্জবনে মল্লিকা মাধবী কচি-কচি পাতা নেড়ে ফিরে ডাকছে, মা-হারা হরিণশিশু সোনার আঁচল ধরে বনের দিকে টানছে, প্রাণের দুই প্রিয়সখী গলা ধরে কাঁদছে। একদণ্ডে এত মায়া এত ভালবাসা কাটান কি সহজ ?

মা-হারা হরিণশিশুকে তাত কণ্বের হাতে, প্রিয় তরুলতাদের প্রিয় সখীদের হাতে সঁপে দিতে কত বেলাই হয়ে গেল !

তপোবনের শেষে বটগাছ, সেইখান থেকে তাত কণ্ব ফিরলেন।

দুই সখী কেঁদে ফিরে এল। আসবার সময় শকুন্তলার আঁচলে রাজার সেই আংটি বেঁধে দিলে, বলে দিলে—'দেখিস, ভাই, যত্ন করে রাখিস।'

তারপর বনের দেবতাদের প্রণাম করে, তাত কণ্বকে প্রণাম করে শকুন্তলা রাজপুরীর দিকে চ'লে গেল।

পরের মেয়ে পর হয়ে পরের দেশে চলে গেল—বনখানা আঁধার করে গেল।

ঋষির অভিশাপ কখনো মিথ্যা হয় না। রাজপুরে যাবার পথে শকুন্তলা একদিন শচীতীর্থের জলে গা ধুতে গেল। সেই সময়ে দুর্বাসার শাপে রাজার সেই আংটি শকুন্তলার চিকণ আঁচলের এক কোণ থেকে অগাধ জলে পড়ে গেল, শকুন্তলা জানতেও পারলে না।

তারপর ভিজে কাপড়ে তীরে উঠে, কালো চুল এলো করে

হাসিমুখে শকুন্তলা বনের ভিতর দিয়ে রাজার কথা ভাবতে ভাবতে শূন্য আঁচল নিয়ে রাজপুরে চলে গেল। আংটির কথা মনেই পড়ল না।

অনুশীলনী

□ বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১।। দুর্বাসা কে? তিনি শকুন্তলাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন কেন?

২।। দুর্বাসা শকুন্তলাকে কি অভিশাপ দিয়েছিলেন? তিনি অভিশাপ মোচনের কি উপায়ই বা বলে দিয়েছিলেন?

৩।। রাজপুরীতে ফিরে যাওয়ার সময় রাজা শকুন্তলাকে কি বলে গিয়েছিলেন?

৪।। রাজা কি তাঁর কথা রেখেছিলেন? এই অবস্থায় শকুন্তলার কি হয়েছিল?

৫।। 'পৃথিবীর রাজা সোনার সিংহাসনে, আর বনের রানী কুটীর-দুয়ারে, দুইজনে দুইখানে।'—'পৃথিবীর রাজা' আর 'বনের রানী' কে কে? তাঁরা 'দুইজনে দুইখানে' বলা হয়েছে কেন?

৬।। কণ্ব তপোবনে ফিরে এসে কি শুনলেন? শুনে তাঁর মনোভাব কেমন হল? তারপর তিনি কি উদ্যোগ করতে লাগলেন?

৭।। শকুন্তলা যখন স্বামীর ঘরে যাচ্ছিলেন সেই সময়কার আশ্রমের অবস্থা বর্ণনা করো।

□ আলোচনামূলক সংক্ষিপ্ত / মৌখিক প্রশ্ন :

১।। যাবার সময় রাজা শকুন্তলাকে কি দিয়ে গিয়েছিলেন?

২।। কিন্তু হায়, সোনার রথ কই এল? ....কথাগুলো দিয়ে লেখক কি বোঝাতে চেয়েছেন?

৩।। রাজা চলে গেলে শকুন্তলার দশা কেমন হল?

৪।। দুর্বাসা শকুন্তলাকে যখন অভিশাপ দিয়েছিলেন তখন শকুন্তলা কি করছিলেন?

৫।। শকুন্তলার প্রিয়সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা দুর্বাসার অভিশাপবাণী শুনতে পেয়ে কি করলেন?

৬।। 'বনের দেবতারা সখীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন।'
—সখীদের 'মনোবাঞ্ছা' কি ছিল? দেবতারা তা কিভাবে পূর্ণ করলেন?

৭।। শচীতীর্থের জলে গা ধুতে গিয়ে শকুন্তলার কি হল?



ইন্দ্রনাথের নতুনদা — শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক ঃ বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হুগলী জেলার দেবানন্দপুরে ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন; তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারী। শরৎচন্দ্র শৈশবে প্রতিপালিত হন ভাগলপুরে, মাতুলালয়ে। প্রথম জীবনে তিনি ব্রহ্মদেশে চাকরি করতেন, পরে স্বদেশে ফিরে সাহিত্য সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। গভীর মানবপ্রীতি, অকৃত্রিম সহজ ও সাবলীল ভাষাভঙ্গি, সমাজসচেতনা প্রভৃতি তাঁর সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। রচিত গ্রন্থ ঃ বড়দিদি, বিরাজ বৌ, বিন্দুর ছেলে, পল্লীসমাজ, দেনাপাওনা, দেবদাস, পণ্ডিতমশাই, চন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত, বিপ্রদাস, অরক্ষণীয়া, পথের দাবী, চরিত্রহীন, গৃহদাহ, শেষপ্রশ্ন প্রভৃতি। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ ঃ নারীর মূল্য, স্বদেশ ও সাহিত্য। □

মূল রচনা ঃ শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস শ্রীকান্ত (১ম পর্ব) থেকে 'ইন্দ্রনাথের নতুনদা' অংশটি নেওয়া হয়েছে। □

রচনা-সম্পর্কে ঃ শরৎ-সাহিত্য গ্রামবাংলার বাস্তব কাব্য। তাঁর চার খণ্ডে সমাপ্ত 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসখানি একটি অখণ্ড জীবন-দর্পণ। বহু অভিজ্ঞতা, আশ্চর্য বিচিত্র মানবচরিত্র ও কাহিনীর আকর। 'ইন্দ্রনাথের নতুনদা' অংশটিতে অদ্ভুত, অসম্ভব স্বার্থপর, খেয়ালী, ভীতু চরিত্রের এক কলকাতাবাসীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। এই অংশে লেখকের চরিত্রসৃষ্টির মুন্সীয়ানা, ঘটনা-বৈচিত্র্যসৃষ্টি এবং সহজ-সরল বর্ণনাভঙ্গি পাঠকের মনে রেখাপাত করে। মানুষ

যে কি-পরিমাণ হৃদয়হীন ও স্বার্থপর হতে পারে আমরা নতুনদার কাহিনী থেকে তা জানতে পারব। □

সেদিন কনকনে শীতের সন্ধ্যা। আগের দিন খুব এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় শীতটা যেন ছুঁচের মত গায়ে বিঁধিতেছিল। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। চারিদিক জ্যোৎস্নায় যেন ভাসিয়া যাইতেছে। হঠাৎ ইন্দ্র আসিয়া হাজির। কহিল, -তে থিয়েটার হবে, যাবি? থিয়েটারের নামে একেবারেই লাফাইয়া উঠিলাম। ইন্দ্র কহিল, তবে কাপড় পরে শিগগির আমাদের বাড়ি আয়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে একখানা র‍্যাপার টানিয়া লইয়া ছুটিয়া বাহির হইলাম। সেখানে যাইতে হইলে ট্রেনে যাইতে হয়। ভাবিলাম, উহাদের বাড়ির গাড়ি করিয়া স্টেশন যাইতে হইবে—তাই তাড়াতাড়ি।

ইন্দ্র কহিল, তা নয়। আমরা ডিঙিতে যাব। আমি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলাম। কারণ গঙ্গার উজান ঠেলিয়া যাইতে বহু বিলম্ব হওয়াই সম্ভব। হয়ত বা সময়ে উপস্থিত হইতে পারা যাইবে না। ইন্দ্র কহিল, ভয় নেই, জোর হাওয়া আছে; দেরী হবে না। আমার নতুনদা কলকাতা থেকে এসেছেন, তিনি গঙ্গা দিয়ে যেতে চান।

যাক, দাঁড় বাঁধিয়া পাল খাটাইয়া ঠিক হইয়া বসিয়াছি—অনেক বিলম্বে ইন্দ্রের নতুনদা ঘাটে পৌঁছিলেন। চাঁদের আলোকে তাঁহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। কলকাতার বাবু—অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বাবু। সিল্কের মোজা, চক্‌চকে পাম্প-সু, আগাগোড়া ওভারকোটে মোড়া, গলায় গলাবন্ধ, হাতে দস্তানা, মাথায় টুপি—পশ্চিমের শীতের বিরুদ্ধে তাঁহার সতর্কতার অন্ত নাই। আমাদের সাধের ডিঙিটাকে অত্যন্ত 'যাচ্ছেতাই' বলিয়া কঠোর মত প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রের কাঁধে ভর দিয়া আমার হাত ধরিয়া, অনেক কষ্টে, অনেক সাবধানে নৌকার মাঝখানে জাঁকিয়া বসিলেন।

তোর নাম কিরে?

ভয়ে ভয়ে বলিলাম, শ্রীকান্ত।

তিনি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, আবার শ্রী—কান্ত—। শুধু কান্ত।

নে, তামাক সাজ। ইন্দ্র, হুঁকো-কলকে রাখলি কোথায়? ছোঁড়াটাকে দে—তামাক সাজুক!

ওরে বাবা! মানুষ চাকরকেও ত এমন বিকট ভঙ্গী করিয়া আদেশ করে না। ইন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া কহিল, শ্রীকান্ত, তুই এসে একটু হাল ধর, আমি তামাক সাজছি।

আমি তাহার জবাব না দিয়া তামাক সাজিতে লাগিয়া গেলাম।

শীতের গঙ্গা। অধিক প্রশস্ত নয়। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ডিঙি ওপারে গিয়া ভিড়িল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাতাস পড়িয়া গেল।

ইন্দ্র ব্যাকুল হইয়া কহিল, নতুনদা, এ যে ভারি মুস্কিল হল, হাওয়া পড়ে গেল। আর তো পাল চলবে না।

নতুনদা জবাব দিলেন, এই ছোঁড়াটাকে দে-না, দাঁড় টানুক। কলকাতাবাসী নতুনদার অভিজ্ঞতায় ইন্দ্র ঈষৎ ম্লান হাসিয়া কহিল, দাঁড়! কারুর সাধ্যি নেই নতুনদা, এ স্রোত ঠেলে উজান বেয়ে যায়। আমাদের ফিরতে হবে।

প্রস্তাব শুনিয়া নতুনদা এক মুহূর্তেই একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন, তবে আনলি কেন হতভাগা! যেমন করে হোক, তোকে পৌঁছে দিতেই হবে। আমার থিয়েটারে হারমোনিয়ম বাজাতেই হবে—তারা বিশেষ করে ধরেছে।

ইন্দ্রের অবস্থা সংকট অনুভব করিয়া আমি আস্তে আস্তে কহিলাম, ইন্দ্র, গুণ টেনে নিয়ে গেলে হয় না? কথাটা শেষ হইতে না হইতেই তিনি দাঁত মুখ ভ্যাংচাইয়া উঠিলেন। বলিলেন, তবে যাও না, টানো গে না হে। জানোয়ারের মত বসে থাকা হচ্ছে কেন?

তারপর একবার ইন্দ্র, একবার আমি, গুণ টানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আবার তারই মাঝে মাঝে বাবুর তামাক সাজার জন্য নৌকা থামাইতে হইল। অথচ বাবুটি ঠায় বসিয়া রহিলেন—এতটুকু সাহায্য করিলেন না।

ইন্দ্র কহিল, সামনেই একটা বেশ বড় বস্তি নতুনদা, সব জিনিস পাওয়া যায়।

তবে লাগা লাগা—ওরে ছোঁড়া—ঐ, টান্‌না একটু জোরে—ভাত খাসনে? ইন্দ্র—বল্‌না তোর ঐ ওটাকে, একটু জোর করে টেনে নিয়ে চলুক।

ইন্দ্র কিংবা আমি কেহই তাহার জবাব দিলাম না। অনতিকাল পরে একটা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এইখানে পাড়টা ঢালু এবং বিস্তৃত হইয়া জলে মিশিয়াছিল। ডিঙি জোর করিয়া ধাক্কা দিয়া সঙ্কীর্ণ জলে তুলিয়া দিয়া আমরা দুজনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

বাবু বলিলেন, হাত পা একটু খেলানো চাই। নাবা দরকার। অতএব ইন্দ্র তাঁহাকে কাঁধে করিয়া নামাইয়া আনিল। তিনি জ্যোৎস্নার আলোকে গঙ্গার শুভ্র সৈকতে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

আমরা দুজনে তাঁহার ক্ষুধা-শান্তির উদ্দেশ্যে গ্রামের ভিতরে যাত্রা করিলাম।

দর্জিপাড়ার বাবু হাততালি দিয়া গান ধরিয়া দিলেন, 'ঠুনঠুন পেয়ালা'।

আমরা অনেক দূর পর্যন্ত তাঁহার সেই মেয়েলি নাকি সুরে সঙ্গীতচর্চা শুনিতে শুনিতে গেলাম।

এ অঞ্চলের পথঘাট, দোকানপত্র সমস্তই ইন্দ্রর জানা ছিল। সে গিয়া মুদির দোকানে উপস্থিত হইল। কিন্তু দোকান বন্ধ এবং দোকানী শীতের ভয়ে দরজা জানালা রুদ্ধ করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

তখন উভয়েই বাহিরে দাঁড়াইয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া এবং যতপ্রকার ফন্দি মানুষের মাথায় আসিতে পারে, তাহার সবগুলি একে একে চেষ্টা করিয়া, আধঘন্টা পরে রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু ঘাট যে জনশূন্য। জ্যোৎস্নালোকে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূরই যে শূন্য। 'দর্জিপাড়ার' চিহ্নমাত্র কোথাও নাই। ডিঙি যেমন ছিল তেমনি রহিয়াছে—ইনি গেলেন কোথায়? দুজনে প্রাণপণে চীৎকার করিলাম—নতুনদা, ও নতুনদা। কিন্তু কোথায় কে! এ অঞ্চলে মাঝে

মাঝে শীতকালে বাঘের জনশ্রুতিও শোনা যাইত। গৃহস্থ কৃষকেরা দলবদ্ধ 'হুড়ারে'র জ্বালায় সময় সময় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিত। সহসা ইন্দ্র সেই কথায় বলিয়া বসিল, বাঘে নিলে না ত রে!

সহসা উভয়েরই চোখে পড়িল কিছুদূরে বালির উপর কি একটা বস্তু চাঁদের আলোয় চক্‌চক্ করিতেছে। কাছে গিয়া দেখি, তাঁরই সেই বহুমূল্য 'পাম্প-সু'-র এক পাটি।

সম্মুখে একটা বালির ঢিপি ছিল। সেইটা অতিক্রম করিয়াই দেখা গেল, অনেক দূরে জলের ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া পাঁচ-সাতটা কুকুর চীৎকার করিতেছে। যতদূর দেখা গেল, একপাল কুকুর ছাড়া বাঘ ত দূরের কথা, একটা শৃগালও নাই। সন্তর্পণে আরও কতকটা অগ্রসর হইতেই মনে হইল, তাহারা কি-একটা কালোপানা বস্তু জলে ফেলিয়া পাহারা দিয়া আছে। ইন্দ্র চীৎকার করিয়া ডাকিল, নতুনদা!

নতুনদা এক গলা জলে দাঁড়াইয়া অব্যক্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন—এই যে আমি।

দুইজনে প্রাণপণে ছুটিয়া গেলাম; কুকুরগুলো সরিয়া দাঁড়াইল এবং ইন্দ্র ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আকণ্ঠ নিমজ্জিত মূর্চ্ছিতপ্রায় তাহার দর্জিপাড়ার মাসতুতো ভাইকে টানিয়া তীরে তুলিল। আমরা গেলে সেই যে তিনি হাততালি দিয়া 'ঠুনঠুন পেয়ালা' ধরিয়াছিলেন, খুব সম্ভব, সেই সঙ্গীতচর্চাতেই আকৃষ্ট হইয়া গ্রামের কুকুরগুলো দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং এই অশ্রুতপূর্ব গীত এবং অদৃষ্টপূর্ব পোষাকের ছটায় বিভ্রান্ত হইয়া এই মহামান্য ব্যক্তিটিকে তাড়া করিয়াছিল। এতটা আসিয়াও আত্মরক্ষার কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, অবশেষে তিনি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন এবং এই দুর্দান্ত শীতের রাত্রে তুষার-শীতল জলে আকণ্ঠমগ্ন থাকিয়া এই অর্ধঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের ঘোর কাটাইয়া তাঁহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিলেও সে রাত্রে আমাদিগকে কম মেহনত করিতে হয় নাই। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, বাবু ডাঙায় উঠিয়াই প্রথম কথা কহিলেন, আমার এক পাটি পাম্প—? (সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

□ বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১ ।। নতুনদার পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা দাও।

২ ।। শ্রীকান্তের সঙ্গে নতুনদার প্রথম পরিচয়ের বর্ণনা দাও।

৩ ।। নৌকায় যাওয়ার সময় কি ঘটনা ঘটেছিল, সংক্ষেপে লেখো।

৪ ।। নতুনদাকে রেখে ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত কোথায় এবং কেন গিয়েছিল? তারা ফিরে এসে কি দেখল?

৫ ।। কি অবস্থায় তারা নতুনদাকে আবিষ্কার করল? নতুনদার এই অবস্থার কারণ কি?

৬ ।। নতুনদার চরিত্রটি সম্পর্কে তোমার মনোভাব কেমন দশটি বাক্যে গুছিয়ে লেখো।

৭ ।। ইন্দ্রনাথ সম্পর্কে তোমার কি-ধরনের মনোভাব হয়? ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের চরিত্র নিয়ে দু-চার কথায় তুলনামূলক আলোচনা করো।

□ সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক /মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১ ।। 'সেদিন কনকনে শীতের সন্ধ্যা।' সেই সন্ধ্যার বর্ণনা দাও।

২ ।। 'কলকাতার বাবু—অর্থাৎ ভয়ঙ্করবাবু'—এ-কথা বলার কারণ কি?

৩ ।। 'শুধু কান্ত।'—বক্তা শ্রীকান্তের শ্রী কেটে দিয়েছিলেন কেন?

৪ ।। নতুনদা ডাঙায় নামতে চেয়েছিলেন কেন? নেমে তিনি কি করছিলেন?

৫ । 'টুনটুন পেয়ালা'—কি গান? কার গান?

৬ । 'দর্জিপাড়ার মাসতুতো ভাই' কে? তাঁকে কি অবস্থায় কোথা থেকে ইন্দ্রনাথ টেনে তুলেছিল?

৭ ।। 'আমার এক পাটি পাম্প--' এ-কথা কে, কখন উচ্চারণ করেছিল? এই উক্তিটির ভেতর দিয়ে বক্তার চরিত্রের কোন্ দিকটা প্রকাশ পেয়েছে?

৮ ।। নতুনদা কিসের ভয়ে জলে নেমে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলেন?



গ্যালিলিওর আবিষ্কার

—চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

লেখক : চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য পদার্থবিদ্যার কৃতী অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ-লেখক। জন্ম : জুন ২৯, ১৮৮৩ ; মৃত্যু আগস্ট ২৬, ১৯৬১। জন্মস্থান : চব্বিশ পরগণার হরিনাভি। বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখক হিসাবে বাংলা সাহিত্যে ইনি অতিপরিচিত। রচিত গ্রন্থ : নব্যবিজ্ঞান. বাঙালীর খাদ্য, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, পদার্থবিদ্যার নবযুগ প্রভৃতি। □

মূল গ্রন্থ : 'গ্যালিলিওর আবিষ্কার' রচনাটি লেখকের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-কাহিনী' থেকে নেওয়া হয়েছে। □

রচনা-সম্পর্কে : বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনা লিখে যাঁরা সুখ্যাতি অর্জন করেছেন, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁদের অগ্রগণ্য। ১৯৪০ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনাকার্যের সঙ্গে নিযুক্ত থেকেও লেখক সাহিত্যচর্চায় ব্যাপৃত থেকেছেন। অধ্যাপনার কার্যকাল শেষ হওয়ার পরও তাঁর এই চর্চা স্থগিত হয়ে যায়নি। চারুচন্দ্র পণ্ডিত ব্যক্তি। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়, বিশেষত পদার্থবিদ্যায় তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। অথচ তাঁর পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের ভারে রচনাগুলি দুরূহ, নীরস কিংবা একঘেয়ে হয়ে ওঠেনি। ভারি চমৎকার সহজ ও সাবলীল—প্রায় মৌখিক ভাষায় তিনি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন। 'গ্যালিলিওর আবিষ্কার' রচনাটিতেও সেই সহজতা ও সাবলীলতার পরিচয় আছে। □

ইটালি দেশের পিসা শহরের এক গীর্জার অভ্যন্তর। ছাত হতে একটা শিকল নেমে এসেছে, তার থেকে একটা ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে।

উপর দিকে জানালাগুলি খোলা, এক একবার হাওয়া আসছে আর ঝাড়টাকে দোলাচ্ছে। গীর্জার মধ্যে একটি বালক বসে ছিল, আর ঝাড়ের দোলনটা লক্ষ্য করছিল। তার মনে হল, দোলনটা বেশী হোক বা কম হোক, দোলনকাল যেন একই। কিন্তু দোলনকাল কি করে মাপা যেতে পারে ? এ হল তিন শ' বছর আগেকার কথা, ঘড়ি তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। বালকটি ফস্ করে নিজের নাড়ীটা টিপে সময় নির্ধারণ করতে লাগল, আর দেখল সে যা ভেবেছিল ঠিক তাই। দোলনের বিস্তার কম-বেশি যা-ই হোক, দোলনকাল সমান।

সতের বছরের বালক গ্যালিলিও সেদিন বিজ্ঞানের এক নতুন তথ্য আবিষ্কার করল। সঙ্গে সঙ্গে সে ভেবে নিল যে, নাড়ীর স্পন্দন দিয়ে যদি দোলকের দোলনকাল মাপা যায়, তবে অন্য দিকে একটা দোলকের দোলনকাল লক্ষ্য করে নাড়ীর স্পন্দনকাল মাপা সম্ভব হবে। বেশিদিন গেল না, সে একটা ছোট যন্ত্র তৈরী করল, যা দিয়ে নাড়ীর গতি মাপা সম্ভব হল। এই যন্ত্র ডাক্তারদের খুব কাজে লেগে গেল, গ্যালিলিওর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

১৫৬৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী গ্যালিলিও জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন সঙ্গীতজ্ঞ ও গণিতজ্ঞ। কিন্তু এসব চর্চায় পয়সা নেই ভেবে তিনি ছেলেকে কাপড়ের ব্যবসায় লাগিয়ে দিলেন। গ্যালিলিও দুদিনেই দেখলেন, সে কাজ তাঁর নয়। তিনি পিতাকে বুঝিয়ে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্র পড়তে গেলেন।

তখনও পর্যন্ত গ্যালিলিও গণিতবিদ্যার বিশেষ কিছু জানতেন না। এক সুযোগ এল। এই সময় একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক পিসা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এসে গণিতের ছাত্রদের কাছে কতকগুলি বক্তৃতা দিতে থাকেন। অধ্যাপক গ্যালিলিওর কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ছাত্র হিসেবে নিয়ে নিলেন। অল্পকালের মধ্যে বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ বলে গ্যালিলিও প্রসিদ্ধিলাভ করলেন।

এর কিছু দিন পরে গ্যালিলিও পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন অধ্যাপক-রূপে নিযুক্ত হলেন, কিন্তু তাঁর বেতন হল সপ্তাহে মাত্র পাঁচ শিলিং।

এখন অপর অধ্যাপকদের সঙ্গে গ্যালিলিওর ঠোকাঠুকি লাগল। বহু শতাব্দী আগে অ্যারিস্টোটল বিজ্ঞানের যেসব তথ্য প্রকাশ করেছিলেন, নির্বিচারে লোকে সে সকল এতদিনে মেনে আসছিল। গ্যালিলিও বললেন, ও সবের প্রত্যেক কথা যাচাই করে দেখতে হবে। অ্যারিস্টোটল বলেছিলেন, একটা একশ' পাউণ্ডের ওজন ও এক পাউণ্ডের একটা ওজন উপর থেকে ছেড়ে দাও, একশ' পাউণ্ডের ওজন একশ' গুণ দ্রুত পড়বে। গ্যালিলিও বললেন, বাজে কথা, তারা একই সঙ্গে পড়বে।

১৫৯১ সালে একদিন সকালে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যেরা ও অন্য অনেক দর্শক ওই জায়গার বিখ্যাত আনত মিনারের পাদদেশে সমবেত হলেন। গ্যালিলিও মিনারের উপরে উঠলেন, আর সেখান থেকে একটা ছোট বল ও তার একশ' গুণ ভার একটা বড় বল একসঙ্গে ছাড়লেন। উপস্থিত জনমণ্ডলীর প্রত্যেকেই দেখল যে বল দুইটি একই সঙ্গে মাটিতে পড়ল, মাটিতে আঘাত করার শব্দও তারা শুনল। এতদিন ধরে মানুষ যে ধারণা করে আসছিল, প্রকৃতি সুনিশ্চিতভাবে তার প্রতিবাদ করল। কিন্তু নিজেদের চোখ-কান যা-ই জানাক, এই বলাবলি করতে করতে লোকেরা বাড়ি ফিরল,—তা বলে কি শাস্ত্রবাক্য অমান্য করতে হবে ; গ্যালিলিওকে যে করেই হোক দাবিয়ে রাখা দরকার। আর তারা করলও তাই।

তখনও নিউটন জন্মাননি। তাঁর প্রবর্তিত গতিবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কিন্তু গ্যালিলিও পতনশীল পদার্থ সম্বন্ধে বিবিধ নিয়ম প্রকাশ করলেন। পিসাতে তাঁর শত্রুর সংখ্যা বাড়তে লাগল, বাধ্য হয়ে তাঁকে এখানকার চাকুরি ছাড়তে হল, কিন্তু পাড়ুয়াতে তিনি এখানকার চেয়ে ভালো একটা চাকুরি পেলেন। পাড়ুয়াতে তিনি আঠার বছর অধ্যাপনার কাজ করলেন, দেশময় তাঁর যশ ছড়িয়ে পড়ল।

১৬০৯ সালে যখন তিনি একবার ভিনিসে গিয়েছেন, শুনলেন, লিপারসে নামে এক চশমা-বিক্রেতা এক যন্ত্র তৈরী করেছে, যা দিয়ে দূরের জিনিস কাছে দেখায়। লিপারসের যন্ত্র দেখবার চেষ্টা না করেই

গ্যালিলিও নিজে সেই রকমের এক যন্ত্র তৈরীর কাজে লেগে গেলেন। একটা অর্গান পাইপ নিয়ে তার দুদিকে দুখানা চশমার কাঁচ বসালেন, একখানা উত্তল পিঠউঁচু লেন্স, অপরখানা অবতল পিঠবসা লেন্স। ব্যস, একটা দূরবীন হল, দূরের জিনিস কাছে দেখাল। এ দিয়ে গ্যালিলিও অনেক নতুন নক্ষত্র দেখলেন, খালি চোখে যাদের দেখা যায় না। দিন দিন তিনি যন্ত্রের উন্নতিসাধন করতে থাকলেন। একটা ভালো যন্ত্রের মধ্য দিয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে গ্যালিলিও আনন্দে অধীর হলেন। এর আগে কোনদিন মানুষ যা দেখেনি, সে সব তাঁর দৃষ্টিপথে পড়ল। চাঁদে ওই যেসব কালো কালো রেখা আমরা দেখি, সাধারণ লোকে যা চাঁদের কলঙ্ক বলে, গ্যালিলিও দেখলেন, সেগুলো ওখানকার পর্বতশ্রেণী, মাঝে মাঝে গভীর গর্ত। পরিষ্কার রাত্রে দেখা যায় সমস্ত আকাশ জুড়ে এধার থেকে ওধার অবধি আলোর একটা ধারা যেন চলে গিয়েছে,, একে বলা হয় ছায়াপথ। গ্যালিলিও তাঁর তৈরী দূরবীক্ষণ দিয়ে লক্ষ্য করলেন যে, ওটা বহুসংখ্যক নক্ষত্রের সমষ্টি, আর কিছু নয়।

সূর্যকে যে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ প্রদক্ষিণ করছে, গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ সুনিশ্চিতভাবে তা প্রমাণ করল। গ্যলিলিওর শত্রুরা বিভ্রান্ত হল।

এই সময়ে গ্যালিলিও বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ কেপলারকে লিখেছেন, —"প্রিয় কেপ্‌লার, আমরা দুজনে কাছাকাছি থাকলে খুব এক চোট হেসে নিতুম। পাড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপককে দূরবীক্ষণ দিয়ে আকাশের গ্রহনক্ষত্র নিরীক্ষণ করবার জন্য নিমন্ত্রণ করলুম। তিনি এলেন না পাছে চোখে দেখে স্বীকার করতে হয় যে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরছে।"

গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে চক্রান্ত সফল হয়। গ্যালিলিও বিচারকদের সম্মুখে আনীত হলেন, অভিযোগ, শাস্ত্রে যা লেখা আছে তার বিরুদ্ধ-কথা তিনি প্রচার করছেন। বলা বাহুল্য, বিচারকদের মধ্যে একজনও বিজ্ঞানী ছিলেন না। গ্যালিলিওর প্রতি আদেশ হল, তিনি তাঁর মত

প্রচারে বিরত থাকবেন, আর তা না হলে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে। গ্যালিলিও প্রথমটায় স্বীকৃতি দিয়ে চলে এলেন। কিন্তু তিনি তাঁর কথা রাখলেন না। যুক্তি দিয়ে শাস্ত্রীয় মত খণ্ডন করে, নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করে তিনি এক পুস্তক প্রকাশ করলেন। ফলে তাঁকে নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে আবদ্ধ রাখা হল, তবে লোকজন দেখা করার কোন বাধা রইল না। এখানে ইংলণ্ডের মহাকবি মিলটন গ্যালিলিওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁকে জানান যে, তাঁর বই ইংলণ্ডের বহু লোক আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করছে। অবরুদ্ধ অবস্থায় তাঁর স্বাস্থ্য ভগ্ন হতে লাগলো। তিনি বধির হলেন, শেষে দৃষ্টিপাত হারালেন।

দৃষ্টিহীন, বয়স আশির কাছাকাছি, ১৬৪২ সালের ৮ই জানুয়ারী তিনি ইহলোক ত্যাগ করলেন।

অনুশীলনী

□ **বিষয়মুখী প্রশ্ন :**

১।। 'সতের বছরের বালক গ্যালিলিও সেদিন বিজ্ঞানের এক নতুন তথ্য আবিষ্কার করল।' —বিজ্ঞানের সেই নতুন তথ্য কি? কি ভাবে তা বালক গ্যালিলিও আবিষ্কার করেন?

২।। কিভাবে গ্যালিলিও নাড়ির গতি-মাপা যন্ত্র আবিষ্কার করেন?

৩।। গ্যালিলিওর শিক্ষাজীবন সম্পর্কে কি জানো?

৪।। 'বাজে কথা, তারা একই সঙ্গে পড়বে।' কোন্ প্রসঙ্গে, কে এই রকম মন্তব্য করেছিলেন? তিনি এ-ব্যাপারে কি প্রমাণ দিয়েছিলেন?

৫।। গ্যালিলিও কিভাবে দূরবীন আবিষ্কার করলেন?

৬।। 'চাঁদের কলঙ্ক' ও 'ছায়াপথ' সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সত্যটি কি বলে জানালেন গ্যালিলিও?

৭।। 'সূর্যকে যে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ প্রদক্ষিণ করছে' তা গ্যালিলিও কিসের সাহায্যে প্রমাণ করলেন?

৮।। জ্যোতির্বিদ কেপলারকে পত্রে কি লিখেছিলেন গ্যালিলিও?

৯।। কিভাবে গ্যালিলিওর বিচার হয়? তার ফল কি হয়?

☐ আলোচনামূলক সংক্ষিপ্ত / মৌখিক প্রশ্ন :

১ ॥ গ্যালিলিওর পিতার পরিচয় দাও।

২ ॥ গ্যালিলিও পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি বিষয়ে পড়তে গিয়েছিলেন ?

৩ ॥ পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হওয়ার পর গ্যালিলিও সপ্তাহে কত বেতন পেতেন ?

৪ ॥ 'অ্যারিস্টোটল বলেছিলেন'—অ্যারিস্টোটল কে ? তিনি কি বলেছিলেন ?

৫ ॥ 'তখনও নিউটন জন্মাননি ?'—নিউটন কে ? তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে কেন ?

৬ ॥ দূরবীন কি ?

৭ ॥ ছায়াপথ কাকে বলে ?

৮ ॥ মহাকবি মিলটন সম্পর্কে কি জানো ? তিনি গ্যালিলিওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কি বলেছিলেন ?





রামকৃষ্ণ ও মধুসূদন-অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

লেখক : 'কল্লোল' সাহিত্যিক গোষ্ঠীর অন্যতম প্রাণপুরুষ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (জন্ম : ১৩১০ বঙ্গাব্দ) বাংলা কথা-সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য লেখক। তিনি বহু উপন্যাস, গল্প ও কবিতা লিখেছেন। শেষদিকে তিনি রামকৃষ্ণ, সারদা, বিবেকানন্দের জীবনকথা অবলম্বন করে কয়েকখানি অসামান্য গ্রন্থ রচনা করেন। 'পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ' এ-জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সম্প্রতি লেখক পরলোকগমন করেছেন। □

মূল রচনা : 'রামকৃষ্ণ ও মধুসূদন' রচনাটি লেখকের 'পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ' গ্রন্থের অন্তর্গত।

রচনা-সম্পর্কে : 'রামকৃষ্ণ ও মধুসূদন' রচনাটিতে লেখক রামকৃষ্ণের সঙ্গে মধুসূদনের সাক্ষাৎকারের একটি অনুপম দৃশ্য বর্ণনা করেছেন। রামকৃষ্ণ সহজ সরল আত্মভোলা মানুষ। সাধারণ অশিক্ষিত গরিব-গুর্বোদের সঙ্গে খোলামনে মিশতে পারেন ; কথা বলতে পারেন। কিন্তু তাঁর যত ভয় আর কুণ্ঠা উচ্চশিক্ষিত সাহেবসুবো পণ্ডিত মানুষদের সঙ্গে মিশতে বা কথা বলতে। একবার মথুরবাবুর জমিদারির মামলা-মোকদ্দমার কাজে ব্যারিস্টার মধুসূদনকে দক্ষিণেশ্বরে আসতে হয়। সেই সময় রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এখানে সেই সাক্ষাৎকারের দৃশ্যটির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ভারি কাব্যিক, ঝকঝকে, মুক্তোর মতো নিটোল শব্দের মালা গেঁথে অচিন্ত্যকুমার এই দৃশ্যটি রচনা করেছেন। □

নারায়ণকে ডাকলেন ঠাকুর। বললেন, 'একা যেতে ভয় করছে। তুমি সঙ্গে চল।'

'আমি গিয়ে কি করব ?' নারায়ণ আপত্তি করল।

'তবু তুমি পণ্ডিত মানুষ, দুটো কথা কইতে পারবে। তর্ক তুললে পারবে সামাল দিতে। আমি আকাট, হ্যাঁ-না কিছুই বলতে পারব না। তুমি সঙ্গে থাকলে তবু খানিকটা বল হবে।'

নারায়ণ শাস্ত্রীকে আগে রেখে এগুতে লাগলেন ঠাকুর।

কিন্তু মধুসূদনের কাছে পৌঁছেই বেসুর ধরল নারায়ণ। সরাসরি জিগ্‌গেস করে বসল, 'তুমি ধর্ম ছেড়েছ কেন ?'

প্রথমেই এমন একটা প্রশ্ন করতে হয় ? তাও এমন রুষ্ট স্বরে ? ঠাকুর যেন ফাঁপরে পড়লেন।

কি বলবে ঠিক যেন কিছু বুঝে উঠতে পারছে না মধুসূদন। কাতর চোখে শূন্যে তাকিয়ে রইল।

মধুসূদন নিজের পেটের উপর হাত রাখল। বললে, 'পেটের জন্যে।'

'পেটের জন্যে বাপ-ঠাকুরদার ধর্ম ছাড়লে তুমি ?' নারায়ণ শাস্ত্রী বোমার মত ফেটে পড়ল : 'এই দুর্দিনের সংসারে পেটের দায়ে ধর্ম ছাড়া ? কি হত ধর্মচ্যুত না হলে ? কি হত ?'

'মরে যেতাম।' বললে মধুসূদন।

'না হয় মরেই যেতে। ধর্মের চেয়ে তুচ্ছ দেহটা বড় হল ?' নারায়ণ হুংকার করে উঠল। 'যে পেটের জন্যে ধর্ম ছাড়ে তার সঙ্গে কথা কইব কি, তার মুখদর্শন করাও পাপ।' ব'লে নারায়ণ চলে গেল ঘর ছেড়ে।

ঠাকুর একা পড়লেন। অবরোধের যে প্রাচীর সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তা সরে যেতেই পড়লেন একেবারে ফাঁকা মাঠে।

পরিপূর্ণ চোখে মধুসূদন তাকাল ঠাকুরের দিকে। এমন সুন্দর মানুষ তো কই আর দেখিনি। চোখভরা করুণা আর ক্ষমা, মুখভরা আর্তিহরণ প্রসন্নতা।

বললে, 'আপনিও কি আমাকে ত্যাগ করলেন ?'

ঠাকুর হাসিমুখে তাকিয়ে রইলেন। সে হাসির অর্থ, আমি কি কাউকে ত্যাগ করতে পারি ? অশ্রদ্ধেয় ব'লে অপাঙ্‌ক্তেয় ব'লে কেউ কি আছে আমার কাছে ?

'তাহলে আমাকে কিছু বলুন। কিছু উপদেশ দিন।' মিনতিময় চোখ তুলে মধুসূদন তাকাল ঠাকুরের দিকে।

ঠাকুর কি বলতে যাচ্ছেন, সহসা কে তাঁর মুখ চেপে ধরল।

এ কি, তিনি কথা কইতে পারছেন না কেন? কে তাঁর মুখ চেপে ধরল? কে?

আর কে! স্বয়ং কালী সনাতনী।

'এ কি, আমাকে দুটো কথা কইতে দিবি নে?'

না, যে ধর্মদ্রোহী, তার সঙ্গে আবার কি কথা! তাকে আবার কিসের সান্ত্বনা, কিসের উপদেশ! স্তব্ধ হয়ে থাকো। প্রত্যাখ্যান করে দাও।

'কিছু বলুন আমাকে।' সস্পৃহচোখে তাকিয়ে রইল মধুসূদন।

'আশ্চর্য, আমি তো বলতে চাই, কিন্তু কে যেন আমার মুখ চেপে ধরেছে। কিছুই দিচ্ছে না বলতে।' ব্যথায় যেন ছটফট করে উঠলেন ঠাকুর।

মনের মধ্যে ম্লান হয়ে গেল মাইকেল। আমি এতই অভাজন? এতই অকিঞ্চন? শুধু আমারই কি স্থান নেই পদাশ্রয়ে?

মা, কৃপা কর। তুই তো সকলের মা। পাপী-তাপী অক্ষম-অধম সকলের অঙ্কদায়িনী। তবে কেন তুই বিমুখ হয়ে থাকবি? কেন তুই ব্যথার স্থানে উপশমের হাত বুলিয়ে দিবি নে?

ঠাকুরের মুখ থেকে হাতের বাধা সরে গেল বুঝি।

ঠাকুর উল্লসিত হয়ে উঠলেন। সাহ্লাদ-সুন্দর মুখে বললেন, 'আমাকে কথা কইতে দিচ্ছে না বটে, কিন্তু দাঁড়াও তোমাকে গান শোনাই। গান শুনলেই তুমি শান্তি পাবে।'

শান্তির ঠাকুর গান ধরলেন। রামপ্রসাদের গান।

হৃদয়ের ভালবাসা বৈধী রীতির ধার ধারে না। ঈশ্বরকে কী পূজা করব যদি মানুষকে না ভালবাসতে পারি?

মাইকেলের রক্তাক্ত ক্ষতে আরামের প্রলেপ পড়ল। অশ্রুতে ভরে উঠল দু'নয়ন।

অনুশীলনী

□ বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১ ॥ রামকৃষ্ণ নারায়ণ শাস্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মধুসূদনের কাছে যেতে চেয়েছিলেন কেন ?

২ ॥ নারায়ণ মধুসূদনের কাছে পৌঁছেই কি কৈফিয়ত তলব করলেন ?

৩ ॥ তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে মধুসূদন কি বললেন ?

৪ ॥ 'ধর্মের চেয়ে তুচ্ছ দেহটা বড় হল ?' এ -কথা কে, কাকে, কখন বলেছিলেন ? তার উত্তরে শ্রোতা কি বলেছিলেন ?

৫ ॥ রামকৃষ্ণের সঙ্গে মধুসূদনের একান্ত নিভৃত সাক্ষাৎকারটি নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

৬ ॥ 'তাহলে আমাকে কিছু বলুন। উপদেশ দিন।'—একথা কে, কাকে বলেছিলেন ? কেন বলেছিলেন ?

৭ ॥ কে তাঁর মুখ চেপে ধরল ? —এখানে কার কথা বলা হয়েছে ? কে, কার মুখ চেপে ধরেছিলেন ? কেন ?

৮ ॥ 'গান শুনলেই তুমি শান্তি পাবে।' এ -কথা কে, কাকে, কখন এবং কেন বলেছিলেন ?

৯ ॥ কথাগুলোর সরলার্থ কি ?—'ঈশ্বরকে কী পূজা করব যদি মানুষকে না ভালবাসতে পারি ?'

□ অলোচনামূলক সংক্ষিপ্ত / মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১ ॥ নারায়ণ শাস্ত্রী কে ? তাঁকে ঠাকুর সঙ্গে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন ?

২ ॥ নারায়ণ মধুসূদনকে ধর্মছাড়ার জন্য ভৎর্সনা করেছিলেন কেন ?

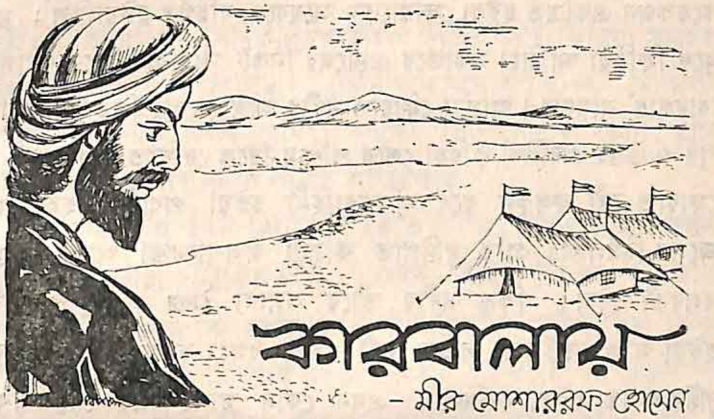
৩ ॥ নারায়ণ মধুসূদনের সামনে থেকে কেন চলে গেলেন ?

৪ ॥ মধুসূদন কি রকম ভাবে ঠাকুরের দিকে তাকিয়েছিলেন ?

৫ ॥ 'শান্তির ঠাকুর' কে ? কেন তা বলা হয়েছে ?

৬ ॥ রামপ্রসাদ কে ? তাঁর গান কি গান নামে খ্যাত ?

৭ ॥ 'হৃদয়ের ভালবাসা বৈধী রীতির ধার ধারে না'— বৈধী রীতি কি ?



কারবালায়

– মীর মোশাররফ হোসেন

লেখক : মীর মোশাররফ হোসেন বাংলা সাহিত্যের একজন যথার্থ সুলেখক এবং উচ্চাঙ্গের গদ্যকার। নদীয়া জেলার লাহিড়ীপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে জন্ম। পিতার নাম মুরাজ্জাস হোসেন এবং মাতার নাম দৌলতন্নেসা বেগম। মীর উচ্চশিক্ষিত এবং সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে জমিদার দর্পণ, আমার জীবনী প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থায়ী কীর্তি ও যশের উৎস, বিখ্যাত 'বিষাদসিন্ধু' গ্রন্থটির জন্য। □

উৎস : 'কারবালায়' শীর্ষক রচনাংশটি মীর মোশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থটি থেকে নেওয়া হয়েছে। □

রচনা-সম্পর্কে : ৬১ হিজরি সনের মহরম মাসের ৬ তারিখে পয়গম্বর মহম্মদের কনিষ্ঠ দৌহিত্র মদিনার অধিপতি ইমাম হোসেন কুফা যাওয়ার পথে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় সপরিবারে নিহত হন। এই শোকাবহ ঘটনাকে স্মরণ করে মহরম মাসের দশম দিবসে মুসলমানগণ মহরম পালন করেন। এই দিনটি তাঁদের পরম শোক প্রকাশের দিন। মোশাররফ হোসেন এই মর্মস্পর্শী শোকাবহ ঘটনা অবলম্বনে 'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থটি রচনা করেন। 'কার-বালায়' রচনাংশটি করুণ রসাত্মক। লেখকের অপূর্ব বর্ণনায়, ভাষার সহজ সাবলীল মাধুর্যে এবং করুণ রসাত্মক আবেদনে এই অংশটি হার্দ্র হয়ে উঠেছে। এমন অপূর্ব চিত্তস্পর্শী অনুপম গদ্যশৈলী আমাদের সাহিত্যের অতি অল্প লেখকই আয়ত্ত করতে পেরেছেন। □

কারবালা প্রান্তরে যে সকল ক্রীতদাস হোসেনের সঙ্গে ছিল, তাহারা কয়েকজন একত্রিত হইয়া ফোরাতের অম্বেষণে বহির্গত হইয়াছিল ; ম্লান মুখে ফিরিয়া আসিয়া সকাতরে এমামের নিকট তাহারা বলিতে লাগিল, 'বাদশাহ' নামদার ! আমরা ফোরাত নদীর অম্বেষণে বহির্গত হইয়াছিলাম। পূর্ব ও উত্তর প্রদক্ষিণ করিয়া শেষে পশ্চিম দিকে দেখিতে পাইলাম যে ফোরাত নদী কুলুকুলু রবে দক্ষিণবাহিনী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। জলের নির্মলতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জলপানেচ্ছা আরও চতুর্গুণ বলবতী হইল। কিন্তু নদীর তীরে অসংখ্য সৈন্য সশস্ত্রে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অতি সতর্কতার সহিত নদীর জল রক্ষা করিতেছে। যতদূরে দৃষ্টির ক্ষমতা হইল, দেখিলাম—এমন কোন স্থানই নাই যে, নির্বিঘ্নে এক বিন্দু জল লইয়া পিপাসা নিবৃত্তি করা যায়। আমরা সৈন্যদিগকে কিছু না বলিয়া যেমনই নদীতীরে যাইতে অগ্রসর হইয়াছি, তাহারা অমনই অতি কর্কশ বাক্যে বিশেষ অপমানের সহিত আমাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিয়া বলিল, 'মহারাজ এজিদের আজ্ঞায় ফোরাত নদীকূল রক্ষিত হইতেছে। এই রক্ষক বীরগণের একটি প্রাণও বাঁচিয়া থাকিতে এক বিন্দু জল কেহ লইতে পারিবে না। আমাদেঁর মস্তকের শোণিত ভূতলে প্রবাহিত না হইলে ফোরাত-প্রবাহে কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দিব না। জল লইয়া পিপাসা নিবৃত্তি করা ত অনেক দূরের কথা। এবার ফোরাতকূল চক্ষে দেখিয়াই ইহজীবন সার্থক করিয়া গেলে—যাও, ভবিষ্যতে এদিকে আসিলে আমাদের দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত থাকিতে হইবে। নদীতীরে এক পদও অগ্রসর হইতে দিব না এবং সুতীক্ষ্ণ শরই তোমাদের পিপাসার শান্তি করিবে। প্রাণ বাঁচাইয়া ফিরিয়া যাও! নিশ্চিত জানিও ফোরাতের সুস্নিগ্ধ বারি তোমাদের কাহারও ভাগ্যে নহে।"

কথা শুনিয়া হোসেন মহাব্যস্ত হইলেন। খাদ্যাদির অভাব না থাকিলেও জল বিহনে কিরূপে বাঁচিবেন, এই চিন্তাই তাঁহার প্রবল হইল। মদিনার বহুসংখ্যক লোক সঙ্গে রহিয়াছে। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাগণ যখন পিপাসায় কাতর হইবে, যখন তাহাদের জিহ্বাকণ্ঠ শুষ্ক হইয়া অর্ধোচ্চারিত কথা বলিতেও ক্ষমতা থাকিবে না, তখন কি

করিবেন ? এই চিন্তায় হোসেন ফোরাত নদীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কি উপায়ে জল সংগ্রহ করিবেন ভাবিতেছেন—এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে চারিজন সৈনিক পুরুষ তাঁহার শিবির লক্ষ্য করিয়া সম্ভবতঃ কিছু ত্রস্তে চলিয়া আসিতেছে। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, 'মোসলেম আমার কুফা গমনে বিলম্ব দেখিয়া হয়তো সৈনিকগণকে কোন স্থানে রাখিয়া অগ্রে আমার সন্ধান লইতে আসিতেছে।'

আগন্তুক চতুষ্টয় যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই তাঁহার কল্পনা যে ভ্রমসঙ্কুল তাহা প্রমাণিত হইল। শেষে তিনি দেখিলেন যে তাহারা অপরিচিত ; এমন কি কোন স্থানে তাহাদিগকে দেখিয়াছেন কিনা, তাহাও মনে হইল না। সৈন্য চতুষ্টয় নিকটে আসিয়াই হোসেনের পদ চুম্বন করিল। তন্মধ্য হইতে অপেক্ষাকৃত সজ্জিত পুরুষ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া নতশিরে বলিতে লাগিলেন, 'হজরত ! দুঃখের কথা কি বলিব আমরা এজিদের সৈন্য। কিন্তু আপনার মাতামহের উপদিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত। আমাদের কথায় অবিশ্বাস করিবেন না, শত্রুর বেতনভোগী বলিয়াও শত্রু মনে করিবেন না। আমরা কিছুই প্রত্যাশী নহি, কেবল আপনার দুঃখে দুঃখিত হইয়া কয়েকটি কথা মাত্র বলিতে অতি সাবধানে আপনার শিবিরে আসিয়াছি। সময় যখন মন্দ হইয়া উঠে, তখন চতুর্দিক হইতেই অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে, এক্ষণে আপনার চতুর্দিকেই অমঙ্গল দেখিতেছি। মোসলেমের ন্যায় হিতৈষী বন্ধু জগতে আপনার কেহই হইবে না। আবদুল্লাহ জেয়াদ আপনার প্রাণ বিনাশ করিবার আশায় ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। ভাগ্য-বিপাকে মোসলেম কুফায় যাইয়া আবদুল্লাহ জেয়াদের হস্তে বন্দী হইলেন। শেষে তাহারি চক্রান্তে ওতবে অলীদ ও মারওয়ানের হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিয়া স্বর্গবাসী হইয়াছেন। এক্ষণে সীমার ওমর প্রভৃতি আপনার প্রাণবধের জন্য নানা প্রকার চেষ্টায় আছে। মারওয়ান, ওতবে, অলীদ এ পর্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। এজিদের আজ্ঞাক্রমে আমরাই ফোরাত নদীকূল একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছি। মনুষ্য দূরে থাকুক, পশুপক্ষীকেও না ছাড়িয়া দিলে নদীতীরে যাইতে কাহারও সাধ্য নাই। সংক্ষেপে সকলই বলিলাম,

যাহা ভাল বিবেচনা হয়, করিবেন।" এই বলিয়াই আগন্তুক চতুষ্টয় হোসেনের পদচুম্বন করিয়া চলিয়া গেল।

মোসলেমের দেহত্যাগের সংবাদে হোসেন মহা শোকাকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "হে ভ্রাতঃ মোসলেম! যাহা বলিয়া গিয়াছিলে তাহাই ঘটিল!—হোসেনের প্রাণ বিনাশ করিতেই যদি আবদুল্লাহ জেয়াদ কোন ষড়যন্ত্র করিয়া থাকে তবে সে ষড়যন্ত্রে আমিই পড়িব। হোসেনের প্রাণ ত রক্ষা পাইবে। ভাই! নিজ প্রাণ দিয়া হোসেনকে জেয়াদের হস্ত হইতে রক্ষা করিলে! তুমি ত মহা অক্ষয় স্বর্গসুখী হইয়া জগৎ-যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইলে। আমি দুরন্ত কারবালা প্রান্তরে অসহায় হইয়া বিন্দুমাত্র জলের প্রত্যাশায় বোধ হয় সপরিবারে জীবন হারাইলাম। রে দুরন্ত পাপিষ্ঠ জেয়াদ! তোর চক্রান্তে মোসলেমকে হারাইলাম। তোর চক্রান্তেই আজ সপরিবারে জল-বিহনে মারা পড়িলাম।" মোসলেমের জন্য হোসেন অনেক দুঃখ করিতে লাগিলেন। ওদিকে জলাভাবে তাঁহার সঙ্গিগণের মধ্যে মহা কোলাহল উপস্থিত হইল।

সকলেই পিপাসাক্রান্ত হইয়া হোসেনের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিলেন—"জলাভাবে সমস্ত লোক মরে। পিপাসায় সকলেই শুষ্ককণ্ঠে, এক্ষণে আর কষ্ট সহ্য হয় না।"

সকাতরে হোসেন বলিলেন—"কি করি! বিন্দুমাত্র জলও পাইবার প্রত্যাশা আর নাই। সকলেই আপন আপন স্থানে যাইয়া ঈশ্বরোপ-সনায় মনোনিবেশ কর।"

অতঃপর সকলেই পরমেশ্বরের আরাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। ক্রমে নয় তারিখ কাটিয়া গেল। দশম দিনের প্রাতে হোসেনের শিবিরে মহাকোলাহল উঠিল। "প্রাণ যায় আর সহ্য হয় না।"—এই প্রকার গগনভেদী শব্দ উঠিতে লাগিল।

শাহ্‌রেবানু দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তানটি ক্রোড়ে করিয়া আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "আজ সাতদিনের মধ্যে এক বিন্দু জলও স্পর্শ করিলাম না, পিপাসায় আমার জীবন শেষ হউক তাহাতে

কিছু মাত্র দুঃখ করি না ; কিন্তু স্তনের দুগ্ধ পর্যন্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এই দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রাণনাশের উপক্রম হইল। এই সময় এক বিন্দু জল যে কোন উপায়ে উহার কণ্ঠে প্রবেশ করাইতে পারিলেও বোধ হয় এ বাঁচিতে পারিত।"

হোসেন বলিলেন, "জল কোথায় পাইব? এজিদের সৈন্যগণ ফোরাত নদীর কূল আবদ্ধ করিয়াছে। জল আনিতে কাহারও সাধ্য নাই।"

শাহ্‌রেবানু বলিলেন, "এই শিশু সন্তানটির জীবন রক্ষার্থে যদি আপনি নিজে গিয়াও কিঞ্চিৎ জল উহাকে পান করাইতে পারেন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি, একটি প্রাণ্‌ ত রক্ষা হইবে! আমাদের জন্য আপনাকে যাইতে বলিতেছি না।"

হোসেন বলিলেন, "জীবনে কোন দিন শত্রুর নিকট, কি বিধর্মীর নিকট কোন বিষয়েই প্রার্থী হই নাই। কাফেরের নিকট কোন কালে কিছু প্রার্থনাও করি নাই। জল চাহিলে কিছুতেই পাইব না। আর আমি এই শিশুর প্রাণ রক্ষার কারণেই যদি তাহাদের নিকট জল ভিক্ষা করি, তবে আমি চাহিলেই বা তাহারা জল দিবে কেন? আমাকে মনোকষ্ট মনোবেদনা দিতেই ত তাহারা ফোরাতকূল আবদ্ধ করিয়াছে।"

শাহ্‌রেবানু বলিলেন, "তাহা যাহাই বলুন, আমরা বাঁচিয়া থাকিতে কি বলিয়া এই দুগ্ধপোষ্য সন্তান দুগ্ধ-পিপাসায়— শেষে জল-পিপাসায় প্রাণ হারাইবে, ইহা কিরূপেই বা স্বচক্ষে দেখিব?"

হোসেন আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। সত্বর উঠিয়া গিয়া অশ্ব সজ্জিত করিয়া আনিয়া বলিলেন, "দাও আমার ক্রোড়ে দাও। দেখি আমার সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়া দেখি।"—এই বলিয়া হোসেন অশ্বে উঠিলেন। শাহ্‌রেবানু সন্তানটিকে হস্তে লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে স্বামীর ক্রোড়ে বসাইয়া দিলেন। হোসেন পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অশ্বে কষাঘাত করিলেন। মুহূর্ত মধ্যে তিনি ফোরাত নদীতীরে উপস্থিত হইয়া নদী তীরস্থ সৈন্যগণকে বলিলেন, "ভাই সকল, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ মুসলমান থাক, তবে এই দুগ্ধপোষ্য শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া কিঞ্চিৎ জলদান কর। পিপাসায় ইহার কণ্ঠতালু শুকাইয়া একেবারে নীরস কাষ্ঠের ন্যায় হইয়াছে।

এ সময় কিঞ্চিৎ জল পান করাইতে পারিলেও বোধ হয় এ বাঁচিতে পারে। তোমাদের ঈশ্বরের দোহাই, এই শিশু সন্তানটির জীবন রক্ষার্থে ইহার মুখের প্রতি চাহিয়া কিছু জল দান কর। এই দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রাণরক্ষা করিলে পরমেশ্বর তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন।"

কেহই উত্তর করিল না। সকলেই একদৃষ্টে হোসেনের দিকে চাহিয়া রহিল। হোসেন পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "ভাই সকল, এদিন—চিরদিন তোমাদের সুদিন থাকিবে না, কোন দিন সন্ধ্যা হইবেই হইবে; ঈশ্বরের অনন্ত ক্ষমতার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর, তাঁহাকে একটু ভয় কর; ভ্রাতৃগণ, পিপাসায় জলদান মহা পুণ্য। তাহাতে আবার অল্প-বয়স্ক শিশু! ভ্রাতৃগণ! ইহার জীবন তোমাদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে। আমি সামান্য সৈনিক পুরুষ নহি; আমার পিতা মহামান্য হজরত আলী, মাতামহ নূরনবী হজরত মোহম্মদ, মাতা ফাতেমা জোহারা খাতুনে জেন্নাত। এই সকল পুণ্যাত্মাদিগের নাম স্মরণ করিয়াই এই শিশুসন্তানটির প্রতি অনুগ্রহ কর। মনে কর, যদি আমি তোমাদের নিকট কোন অপরাধে অপরাধী হইয়াও থাকি, কিন্তু এই দুগ্ধপোষ্য বালক ত তোমাদের কোন অনিষ্ট করে নাই। তোমাদের নিকট কোন অপরাধে অপরাধীও হয় নাই। ইহার প্রতি দয়া করিয়াই তোমরা ইহার জীবন রক্ষা কর।"

সৈন্যগণ-মধ্য হইতে একজন বলিল, "তোমার পরিচয় জানিলাম, তুমি সহস্র অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিলেও তোমাকে জল দিব না। তোমার পুত্র জল-পিপাসায় জীবন হারাইবে, তাহাতে তোমার দুঃখ কি? তোমার জীবনও ত এখনই যাইবে; সন্তানের দুঃখে না কাঁদিয়া তোমার নিজের প্রাণের জন্য একবার কাঁদ—অসময়ে পিপাসায় কাতর হইয়া কারবালায় প্রাণ হারাইবে, সেই দুঃখে একবার ক্রন্দন কর। শিশু-সন্তানের জন্য আর কষ্ট পাইতে হইবে না। এখনই তোমার সকল জ্বালা-যন্ত্রণা একেবারে নিবারণ করিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সেই ব্যক্তি হোসেনের বক্ষঃ লক্ষ্য করিয়া এক বাণ নিক্ষেপ করিল। ক্ষিপ্রহস্ত নিক্ষিপ্ত সেই সুতীক্ষ্ণ বাণ হোসেনের বক্ষে না লাগিয়া ক্রোড়স্থ শিশু-

সন্তানের বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া পৃষ্ঠদেশ পার হইয়া গেল। হোসেনের ক্রোড় রক্তে ভাসিতে লাগিল।

হোসেন বলিতে লাগিলেন, "ওরে পাষাণ হৃদয়! ওরে শরনিক্ষেপ-কারি! কি করিলি! এই শিশু সন্তান বধে তোর কি লাভ হইল?"

হোসেন মহাখেদে এই কথা কয়েকটি বলিয়াই সরোষে অশ্বচালনা করিলেন। শিবির সম্মুখে আসিয়া মৃত সন্তান ক্রোড়ে লইয়া লম্ফ দিয়া তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন; শাহ্‌রেবানুর নিকটে গিয়া বলিলেন, "ধর তোমার পুত্র ক্রোড়ে লও! আজ বাছাকে স্বর্গের সুশীতল জল পান করাইয়া আনিলাম।"

শাহ্‌রেবানু সন্তানের বুকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই অজ্ঞান হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

অনুশীলনী

□ বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১॥ 'কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে হঠাৎ প্রভু মোহম্মদের ভবিষ্যৎ বাণী হোসেনের মনে পড়িল'—কিসের কারণ অনুসন্ধানের কথা এখানে বলা হয়েছে? প্রভু মোহম্মদের কোন্ ভবিষ্যৎ বাণী হোসেনের মনে পড়ল?

২॥ কারবালার বর্ণনা দাও।

৩॥ কারবালা প্রান্তরে পৌঁছে এমাম সঙ্গিগণকে কি বলেছিলেন?

৪॥ এমামের ক্রীতদাস, যারা ফোরাত নদীর খোঁজে গিয়েছিল তারা ফিরে এসে এমাম হোসেনকে কি বলেছিল?

৫॥ 'দেখিতে পাইলেন যে, চারিজন সৈনিক পুরুষ তাঁহার শিবির লক্ষ্য করিয়া সম্ভবতঃ কিছু ত্রস্তে চলিয়া আসিতেছে?—'চারিজন সৈনিক পুরুষ' কারা? সেই চারজন সৈনিক এসে কি করল এবং কি বলল?

৬॥ মোসলেমের মৃত্যুসংবাদ শুনে হোসেন কিভাবে বিলাপ করেছিলেন?

৭॥ 'পিপাসায় আমার জীবন শেষ হউক, তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখ করি না; কিন্তু এই দুগ্ধপোষ্য বালকের প্রাণনাশের উপক্রম হইল।'—একথা কে, কাকে বলেছিলেন? ওই ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত কি করলেন?

৯ ॥ 'এই দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রাণরক্ষা করিলে পরমেশ্বর তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন।'—একথা কে, কাকে বলেছিলেন? তারা কি বক্তার অনুরোধ শুনেছিল?

□ আলোচনামূলক সংক্ষিপ্ত / মৌখিক প্রশ্ন

১ ॥ হোসেন সপরিবারে কোথায় যাচ্ছিলেন?

২ ॥ 'মোহম্মদের ভবিষ্যৎ বাণীটি হোসেনের মনে পড়িল।'—ভবিষ্যৎ বাণীটি কি ছিল?

৩ ॥ 'এমন আশ্চর্য ঘটনা জগতে কোন স্থানে ঘটিয়াছে কিনা তাহাও সন্দেহ।'—আশ্চর্য ঘটনাটি কি?

৪ ॥ হোসেনের প্রিয় অনুচর মোসলেম কাদের হাতে নিহত হয়েছিলেন?

৫ ॥ আবদুল্লা জেয়াদ কাকে হত্যা করার জন্য সড়যন্ত্র করেছিল?

৬ ॥ 'আগন্তুকগণ হোসেনের পদচুম্বন করিয়া গেল।'—আগন্তুকগণ কারা?

৭ ॥ সাহ্‌রেবানু কে? হোসেন তাঁর অনুরোধে কি করলেন?

৮ ॥ এমাম হোসেন এবং সাহ্‌রেবানুর শিশুটির কি পরিণতি হয়েছিল?



উৎস ঃ 'ছুটি' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত ছোটগল্পের সংকলন 'গল্পগুচ্ছ' থেকে নেওয়া হয়েছে। □

রচনা-সম্পর্কে ঃ প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন : 'বঙ্গসাহিত্যের অপর নানা ক্ষেত্রেও যেমন, এক্ষেত্রেও (অর্থাৎ ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও) রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন আদি লেখক।... তিনি হচ্ছেন বঙ্গসাহিত্যে ছোটগল্পের আদিস্রষ্টা।' একজন প্রখ্যাত সমালোচক মন্তব্য করেছেন : '....বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।' বস্তুত একথা আজ স্বীকার না করে উপায় নেই যে, উনিশ শতকের শেষদিকে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনা বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা সাহিত্যে সত্যকার ছোটগল্প লেখা হয়নি। রবীন্দ্রনাথই এর স্রষ্টা এবং তাঁর প্রদর্শিত পথেই বাংলা ছোটগল্পের বিকাশ এবং সমৃদ্ধিলাভ। বাংলা ছোটগল্প আজ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ছোট-গল্প-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। 'ছুটি' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পগুলির অন্যতম। এই গল্পটিতেও চিরন্তন, মৌল মানবানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। গ্রামের দরিদ্র মায়ের সন্তান ফটিক, মুক্তপ্রকৃতির 'ছিন্নবাধা পলাতক বালক ; শহরের বদ্ধ, নিরানন্দ, স্নেহ-প্রীতিহীন পরিবেশে কিভাবে তার জীবনমুকুলটি ক্রমশ শুকিয়ে একদিন ঝরে পড়ল, তার এক অসাধারণ করুণ এ মর্মস্পর্শী আলেখ্য রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এমন গল্প রবীন্দ্রনাথও অল্প লিখেছেন। ভাষার সৌন্দর্য, ব্যঞ্জনাগুণ এবং কাব্যিক প্রকাশে এ-গল্প অনন্য। □

বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট করিয়া একটা নূতন ভাবোদয় হইল ; নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ মাস্তুলে রূপান্তরিত

হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল; স্থির হইল, সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে।

যে ব্যক্তির কাঠ আবশ্যককালে তাহার যে কতখানি বিস্ময় বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে, তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল।

কোমর বাঁধিয়া সকলেই যখন মনোযোগের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে ফটিকের কনিষ্ঠ মাখনলাল গম্ভীরভাবে সেই গুঁড়ির উপরে গিয়া বসিল, ছেলেরা তাহার এইরূপ উদার ঔদাসীন্য দেখিয়া কিছু বিমর্ষ হইয়া গেল।

একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে একটু-আধটু ঠেলিল কিন্তু সে তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, এই অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী মানব সকল প্রকার ক্রীড়ার অসারতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।

ফটিক আসিয়া আস্ফালন করিয়া কহিল, 'দেখ্, মার খাবি। এই বেলা ওঠ্।'

সে তাহাতে আরও একটু নড়িয়া চড়িয়া আসনটি বেশ স্থায়ীরূপে দখল করিয়া লইল।

এরূপ স্থলে সাধারণের নিকট রাজসম্মান রক্ষা করিতে হইলে অবাধ্য ভ্রাতার গণ্ডদেশে অনতিবিলম্বে এক চড় কষাইয়া দেওয়া ফটিকের কর্তব্য ছিল—সাহস হইল না। কিন্তু এমন একটা ভাব ধারণ করিল, যেন ইচ্ছা করিলেই এখনি উহাকে রীতিমতো শাসন করিয়া দিতে পারে কিন্তু করিল না, কারণ পূর্বাপেক্ষা আর একটা ভালো খেলা মাথায় উদয় হইয়াছে, তাহাতে আর-একটু বেশী মজা আছে। প্রস্তাব করিল, মাখনকে সুদ্ধ ওই কাঠ গড়াইতে আরম্ভ করা যাক।

মাখন মনে করিল, ইহাতে তাহার গৌরব আছে, কিন্তু অন্যান্য পার্থিব গৌরবের ন্যায় ইহার আনুষঙ্গিক যে বিপদের সম্ভাবনাও আছে, তাহা তাহার কিংবা আর কাহারো মনে উদয় হয় নাই।

ছেলেরা কোমর বাঁধিয়া ঠেলিতে আরম্ভ করিল—'মারো ঠেলা হেঁইয়ো, সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো।' গুঁড়ি একপাক ঘুরিতে না

ঘুরিতেই মাখন তাহার গাম্ভীর্যগৌরব এবং তত্ত্বজ্ঞান-সমেত ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

খেলার আরম্ভেই এইরূপ আশাতীত ফললাভ করিয়া অন্যান্য বালকেরা বিশেষ হৃষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু ফটিক কিছু শশব্যস্ত হইল। মাখন তৎক্ষণাৎ ভূমিশয্যা ছাড়িয়া ফটিকের উপরে গিয়া পড়িল, একেবারে অন্ধভাবে মারিতে লাগিল। তাহার নাকে মুখে আঁচড় কাটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে গমন করিল। খেলা ভাঙিয়া গেল।

ফটিক গোটাকতক কাশ উৎপাদন করিয়া লইয়া একটা অর্ধনিমগ্ন নৌকার গলুইয়ের উপরে চড়িয়া বসিয়া চুপচাপ করিয়া কাশের গোড়া চিবাইতে লাগিল।

এমন সময় একটা বিদেশী নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। একটি অর্ধবয়সী ভদ্রলোক কাঁচা গোঁফ এবং পাকা চুল লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'চক্রবর্তীদের বাড়ি কোথায় ?'

বালক ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল, 'ওই হোথা।' কিন্তু কোন্ দিকে যে নির্দেশ করিল, কাহারও বুঝিবার সাধ্য রহিল না।

ভদ্রলোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথা ?'

সে বলিল, 'জানিনে।' বলিয়া পূর্ববৎ তৃণমূল হইতে রসগ্রহণে প্রবৃত্ত হইল। বাবুটি তখন অন্য লোকের সাহায্য অবলম্বন করিয়া চক্রবর্তীদের গৃহের সন্ধানে চলিলেন।

অবিলম্বে বাঘা বাগদি আসিয়া কহিল, 'ফটিকদাদা, মা ডাকছে।'

ফটিক কহিল, 'যাব না।'

বাঘা তাহাকে বলপূর্বক আড়কোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল, ফটিক নিস্ফল আক্রোশে হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল।

ফটিককে দেখিবামাত্র তাহার মা অগ্নিমূর্তি হইয়া কহিলেন, 'আবার তুই মাখনকে মেরেছিস।'

ফটিক কহিল, 'না, মারিনি।'

'ফের মিথ্যে কথা বলছিস !

'কখ্খনো মারিনি। মাখনকে জিজ্ঞাসা করো।'

মাখনকে প্রশ্ন করাতে মাখন আপনার পূর্ব নালিশের সমর্থন করিয়া বলিল, 'হাঁ, মেরেছে।'

তখন আর ফটিকের সহ্য হইল না। দ্রুত গিয়া মাখনকে এক সশব্দে চড় কষাইয়া দিয়া কহিল, 'ফের মিথ্যে কথা!

মা মাখনের পক্ষ লইয়া ফটিককে সবেগে নাড়া দিয়া তাহার পৃষ্ঠে দুটা-তিনটা প্রবল চপেটাঘাত করিলেন। ফটিক মাকে ঠেলিয়া দিল।

মা চিৎকার করিয়া কহিলেন, 'অ্যাঁ, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস!'

এমন সময়ে সেই কাঁচাপাকা বাবুটি ঢুকিয়া বলিলেন, 'কী হচ্ছে তোমাদের।'

ফটিকের মা বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া কহিলেন, 'ওমা এ যে দাদা, তুমি কবে এলে!' বলিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিলেন।

বহু দিন হইল দাদা পশ্চিমে কাজ করিতে গিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে ফটিকের মার দুই সন্তান হইয়াছে, তাহারা অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু একবারও দাদার সাক্ষাৎ পায় নাই। আজ বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার ভগিনীকে দেখিতে আসিয়াছেন। কিছুদিন খুব সমারোহ গেল। অবশেষে বিদায় লইবার দুই-একদিন পূর্বে বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার ভগিনীকে ছেলেদের পড়াশুনা এবং মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে ফটিকের অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খলতা, পাঠে অমনোযোগ এবং মাখনের সুশান্ত সুশীতলতা ও বিদ্যানুরাগের বিবরণ শুনিলেন।

তাঁহার ভাগিনী কহিলেন, 'ফটিক আমার হাড় জালাতন করিয়াছে!'

শুনিয়া বিশ্বম্ভরবাবু প্রস্তাব করিলেন, তিনি ফটিককে কলিকাতায় লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন। বিধবা এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন।

ফটিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন রে ফটিক, মামার সঙ্গে কল-কাতায় যাবি?'

ফটিক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, 'যাব।'

যদিও ফটিককে বিদায় করিতে তাহার মায়ের আপত্তি ছিল না, কারণ তাঁহার মনে সর্বদাই আশঙ্কা ছিল—কোন্ দিন সে মাখনকে জলেই ফেলিয়া দেয়, কি মাথাই ফাটায়, কি একটা দুর্ঘটনা ঘটায়, তথাপি ফটিকের বিদায়-গ্রহণের জন্য এতাদৃশ আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন।

'কবে যাবে,' 'কখন যাবে' করিয়া ফটিক তাহার মামাকে অস্থির করিয়া তুলিল ; উৎসাহে তাহার রাত্রে নিদ্রা হয় না।

অবশেষে যাত্রাকালে আনন্দের ঔদার্যবশত তাহার ছিপ ঘুড়ি লাটাই সমস্ত মাখনকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার পুরা অধিকার দিয়া গেল।

কলিকাতায় মামার বাড়ি পৌঁছিয়া প্রথমত মামীর সঙ্গে আলাপ হইল। মামী এই অনাবশ্যক পরিবারবৃদ্ধিতে মনে মনে যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার নিজের তিনটি ছেলে লইয়া নিজের নিয়মে ঘর-কন্না পাতিয়া বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে সহসা একটি তেরো বৎসরের অপরিচিত অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে ছেলে ছাড়িয়া দিলে কিরূপ একটা বিপ্লবের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়, বিশ্বম্ভরের এত বয়স হইল, তবু কিছুমাত্র যদি জ্ঞানকাণ্ড আছে।

বিশেষত, তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহ উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্ভতা। হঠাৎ কাপড়-চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে ; লোকে তাহাকে একটা কুশ্রী স্পর্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়, লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না ; এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমা-প্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোনো সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে, তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না, কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়।

অতএব, এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর কোনো অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারদিকের স্নেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মতো বিঁধে। এই বয়সে সাধারণত নারীজাতিকে কোনো এক শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকের দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাঁহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।

মামীর স্নেহহীন চক্ষে সে যে একটা দুর্গ্রহের মতো প্রতিভাত হইতেছে, এইটে ফটিকের সবচেয়ে বাজিত। মামী যদি দৈবাৎ তাহাকে কোনো-একটা কাজ করিতে বলিতেন, তাহা হইলে সে মনের আনন্দে যতটা আবশ্যক তার চেয়ে বেশি কাজ করিয়া ফেলিত,—অবশেষে মামী যখন তাহার উৎসাহ দমন করিয়া বলিতেন, 'ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে। ওতে আর তোমার হাত দিতে হবে না। এখন তুমি নিজের কাজে মন দাওগে। একটু পড়োগে যাও—' তখন তাহার মানসিক উন্নতির প্রতি মামীর এতটা যত্নবাহুল্য তাহার অত্যন্ত নিষ্ঠুর অবিচার বলিয়া মনে হইত।

ঘরের মধ্যে এইরূপ অনাদর, ইহার পর আবার হাঁফ ছাড়িবার জায়গা ছিল না। দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়িয়া কেবলই তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত। প্রকাণ্ড একটা ধাউস ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, 'তাইরে নাইরে নাইরে না' করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বরচিত রাগিণী আলাপ করিয়া অকর্মণ্যভাবে ঘুরিয়া

বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেইসব দলবল, উপদ্রব, স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত।

জন্তুর মতো একপ্রকার অবুঝ ভালোবাসা—কেবল একটা কাছে যাইবার অন্ধ ইচ্ছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত ব্যাকুলতা, গোধূলি সময়ের মাতৃহীন বৎসের মতো কেবল একটা আন্তরিক 'মা মা' ক্রন্দন—সেই লজ্জিত শঙ্কিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলই আলোড়িত হইত।

স্কুলে এতবড়ো নির্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত। মাস্টার যখন মার আরম্ভ করিত তখন ভারাক্লান্ত গর্দভের মতো নীরবে সহ্য করিত। ছেলেদের যখন খেলিবার ছুটি হইত, তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দূরের বাড়িগুলার ছাদ নিরীক্ষণ করিত; যখন সেই দ্বিপ্রহর রৌদ্রে কোনো একটা ছাদে দুটি একটি ছেলেমেয়ে কিছু একটা খেলার ছলে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া যাইত, তখন তাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত।

একদিন অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক সাহসে মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'মামা, মার কাছে কবে যাব?' মামা বলিয়াছিলেন, 'স্কুলের ছুটি হোক।' কার্তিক মাসে পূজার ছুটি, সে এখনো ঢের দেরি। একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। একে তো সহজেই পড়া তৈরি হয় না, তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাস্টার প্রতিদিন তাহাকে অত্যন্ত মারধর অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে তাহার এমন অবস্থা হইল যে, তাহার মামাতো ভাইরা তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিত। ইহার কোনো অপমানে তাহারা অন্যান্য বালকের চেয়েও যেন বলপূর্বক বেশি করিয়া আমোদ প্রকাশ করিত।

অসহ্য বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক তাহার মামীর কাছে নিতান্ত অপরাধীর মতো গিয়া কহিল, 'বই হারিয়ে ফেলেছি।'

মামী অধরের দুই প্রান্তে বিরক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, 'বেশ করেছ : আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারিনে।'

ফটিক আর-কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিল—সে যে পরের পয়সা নষ্ট করিতেছে, এই মনে করিয়া তাহার মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান উপস্থিত হইল, নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া সেই রাত্রে তাহার মাথাব্যথা করিতে লাগিল এবং গা সিরসির করিয়া আসিল। বুঝিতে পারিল তাহার জ্বর আসিতেছে। বুঝিতে পারিল, ব্যামো বাধাইলে তাহার মামীর প্রতি অত্যন্ত অনর্থক উপদ্রব করা হইবে। মামী এই ব্যামোটাকে যে কিরূপ একটা অকারণ অনাবশ্যক জ্বালাতনের স্বরূপ দেখিবে, তাহা সে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিল। রোগের সময় এই অকর্মণ্য অদ্ভুত নির্বোধ বালক পৃথিবীতে নিজের মা ছাড়া আর কাহারো কাছে সেবা পাইতে পারে, এরূপ প্রত্যাশা করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ফটিককে আর দেখা গেল না। চতুর্দিকে প্রতিবেশীদের ঘরে খোঁজ করিয়া তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেদিন আবার রাত্রি হইতে মুষলধারে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়িতেছে। সুতরাং তাহার খোঁজ করিতে লোকজনকে অনর্থক অনেক ভিজিতে হইল। অবশেষে কোথাও না পাইয়া বিশ্বম্ভরবাবু পুলিসে খবর দিলেন।

সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একটা গাড়ি আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবুর বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। তখনো ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে, রাস্তায় এক হাঁটু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

দুইজন পুলিসের লোক গাড়ি হইতে ফটিককে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া বিশ্বম্ভরবাবুর নিকট উপস্থিত করিল। তাহার আপাদমস্তক ভিজা, সর্বাঙ্গে কাদা, মুখ চক্ষু লোহিতবর্ণ, থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। বিশ্বম্ভরবাবু প্রায় কোলে করিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

মামী তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'কেন বাপু, পরের ছেলেকে নিয়ে কেন এ কর্মভোগ। দাও ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।'

বাস্তবিক, সমস্ত দিন দুশ্চিন্তায় তাঁহার ভালো রূপ আহারাদি হয় নাই এবং নিজের ছেলেদের সহিতও নাহক অনেক খিট্‌মিট্ করিয়াছেন।

ফটিক কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, 'আমি মার কাছে যাচ্ছিলুম, আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।'

বালকের জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি প্রলাপ বকিতে লাগিল। বিশ্বম্ভরবাবু চিকিৎসক লইয়া আসিলেন।

ফটিক তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু একবার উন্মীলিত করিয়া কড়িকাঠের দিকে হতবুদ্ধিভাবে তাকাইয়া কহিল, 'মামা, আমার ছুটি হয়েছে কি?"

বিশ্বম্ভরবাবু রুমাল দিয়া চোখ মুছিয়া সস্নেহে ফটিকের শীর্ণ তপ্ত হাতখানি হাতের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন।

ফটিক আবার বিড়বিড় করিয়া বকিতে লাগিল, বলিল, 'মা, আমাকে মারিস্‌নে, মা। সত্যি বলছি, আমি কোনো দোষ করিনি।'

পরদিন দিনের বেলা কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হইয়া ফটিক কাহার প্রত্যাশায় ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া ঘরের চারদিকে চাহিল। নিরাশ হইয়া আবার নীরবে দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিশ্বম্ভরবাবু তাহার মনের ভাব বুঝিয়া তাহার কানের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, 'ফটিক, তোর মাকে আনতে পাঠিয়েছি।'

তাহার পরদিনও কাটিয়া গেল। ডাক্তার চিন্তিত বিমর্ষ মুখে জানাইলেন, অবস্থা বড়োই খারাপ।

বিশ্বম্ভরবাবু স্তিমিতপ্রদীপে রোগশয্যায় বসিয়া প্রতি মুহূর্তেই ফটিকের মাতার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ফটিক খালাসিদের মতো সুর করিয়া বলিতে লাগিল, 'এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে-এ-এ না।' কলিকাতায় আসিবার সময় কতকটা রাস্তা স্টীমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসিরা কাছি ফেলিয়া সুর করিয়া জল মাপিত; ফটিক প্রলাপে তাহাদেরই অনুকরণে করুণ

স্বরে জল মাপিতেছে এবং যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে, বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।

এমন সময়ে ফটিকের মাতা ঝড়ের মতো ঘরে প্রবেশ করিয়াই উচ্চকলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর বহু কষ্টে তাঁহার শোকোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত করিলে, তিনি শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, 'ফটিক, সোনা, মানিক আমার।'

ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল, 'অ্যাঁ'। মা আবার ডাকিলেন, 'ওরে ফটিক, বাপধন রে।'

ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, 'মা এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।'

অনুশীলনী

□ বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১॥ ফটিকের চরিত্র আলোচনা করো। তার চরিত্রের সঙ্গে মাখনের চরিত্র তুলনা করো।

২॥ ফটিকের মা, মামা এবং মামীর চরিত্র আলোচনা করো।

৩॥ 'এই অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী মানব সকল প্রকার ক্রীড়ার অসারতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।'—'এই অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী' মানবটি কে? তাকে 'অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী বলার কারণ কি? সে কোন্ ক্রীড়ার অসারতা সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগল? অকাল-তত্ত্বজ্ঞানীটির পরিণতি কি হয়েছিল?

৪॥ 'বিশেষত, তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই নাই।'—তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলেকে 'বালাই' বলা হয়েছে কেন? কার প্রসঙ্গে লেখক এই মন্তব্য করেছেন? ওই ছেলেটি যে বাড়িতে থাকত তারা তার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করত?

৫॥ "একদিন অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক সাহসে মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মামা, 'মার কাছে যাব'।"—কে মামাকে জিজ্ঞাসা করেছিল? সে মার কাছে যেতে চেয়েছিল কেন? কলকাতার জীবন তার ভালো লাগত না কেন? সে কি সত্যিসত্যিই মার কাছে যেতে পেরেছিল?

৬॥ 'বেশ করেছ; আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে

দিতে পারব না।'—কার প্রতি কার উক্তি? বই হারিয়ে ফেলায় তার স্কুলে কিরকম দুর্গতি হত? বক্তা 'বেশ করেছ' বলে কি তিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন? বক্তা কি সত্যিসত্যিই মাসের মধ্যে পাঁচবার বই কিনে দিতেন?

৭ ॥ 'স্কুল হইতে ফিরিয়া সেই রাত্রে তাহার মাথাব্যথা করিতে, লাগিল এবং গা সিরসির করিতে লাগিল।'—কার মাথাব্যথা করতে লাগল? তার স্কুল কোথায়? সে কার কথায় মনে আঘাত পেয়েছিল? জ্বর নিয়ে সে কি অবস্থায় কোথায় গেল? এই জ্বরের পরিণাম কি হল?

৮ ॥ 'পরদিন প্রাতঃকালে ফটিককে আর দেখা গেল না।'—কোন্ ঘটনার পরদিন এই ব্যাপার ঘটল? ফটিক পালিয়ে গেল কেন? কে তাকে খুঁজে নিয়ে এল?

৯ ॥ 'ফটিক খালাসির মতো সুর করিয়া বলিতে লাগিল, এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে-এ-এ না।'—খালাসি কারা? খালাসিদের কথাগুলো ফটিক কোথায়, কি ভাবে শিখেছিল? কেন সে খালাসির মতো সুর করে কথাগুলি বলেছিল?

১০ ॥ 'মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি'— কে, কাকে কথাগুলি বলেছিল? কখন বলেছিল? 'ছুটি' বলতে এখানে কোন্ ছুটি বোঝানো হয়েছে? 'আমি বাড়ি যাচ্ছি' বলতে কি বোঝানো হয়েছে?

□ আলোচনামূলক সংক্ষিপ্ত / মৌখিক প্রশ্ন :

১ ॥ ফটিক কে? তার ভায়ের নাম কি?

২ ॥ 'অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? কেন?

৩ ॥ ফটিককে কে, কোথায়, কেন নিয়ে গিয়েছিলেন?

৪ ॥ সেখানে ফটিক কি রকম ব্যবহার পেত?

৫ ॥ 'উৎসাহে আর রাত্রে ঘুম হয় না।'—কার? তার উৎসাহের কারণ কি?

৬ ॥ ফটিকের মামী তার সঙ্গে কি রকম আচরণ করতেন? তিনি কিরকম কথা বলতেন তার একটি দৃষ্টান্ত দাও।

৭ ॥ 'এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর কোনো অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক।'— একথা কেন বলা হয়েছে?

৮ ॥ 'এইটে ফটিকের সবচেয়ে বাজিত।' —কোন্‌টি? কেন বাজত?

৯ ॥ 'ফটিক আর-কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল?'—কোথায়? কেন?

১০ ॥ 'অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিয়াছে।'—কে? 'অকূল সমুদ্র' বলতে কি বোঝানো হয়েছে?



লেখক ঃ বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম : ১৮৯৪ ; মৃত্যু : ১৯৫০। লেখকের পৈতৃক নিবাস চব্বিশ পরগণার ব্যারাকপুর-বনগ্রাম। বি. এ. পাশ করে বিভূতিভূষণ শিক্ষকতা-কর্মে নিযুক্ত হন। পরে সাহিত্যসেবাই তাঁর একমাত্র অবলম্বন হয়ে ওঠে। 'পথের পাঁচালী' তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল : অপরাজিত, দৃষ্টিপ্রদীপ, আরণ্যক, ইছামতী, আদর্শ হিন্দু হোটেল, মৌরীফুল, বনে পাহাড়ে, চাঁদের পাহাড় প্রভৃতি। □

উৎস : 'সরস্বতী কুণ্ডী' রচনাংশটি বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। □

রচনা-সম্পর্কে ঃ বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' একটি অরণ্য-কাব্য। 'সরস্বতী কুণ্ডী' রচনাংশে ছোটনাগপুর অঞ্চলের লবটুলিয়া বইহারের প্রকৃতির সৌন্দর্যের পরিচয় ফুটে উঠেছে। বিভূতিভূষণ যে কতো বড়ো প্রকৃতিপ্রেমিক ছিলেন তা এই রচনাংশটি পড়লেই বোঝা যাবে। প্রকৃতির রূপরহস্য তাঁকে মুগ্ধই করেনি, অভিভূত করেছে। প্রকৃতিকে তিনি দেখেছেন জীবন্ত সত্তা রূপে। তাঁর প্রকৃতিপ্রেমের গভীরতা তাঁকে বাংলা কথাসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী করেছে। □

লবটুলিয়ার উত্তর প্রান্ত খুব বড় একটা হ্রদের মত। এরকম জলাশয়কে এদেশে বলে কুণ্ডী। এই হ্রদটার নাম সরস্বতী কুণ্ডী।

সরস্বতী কুণ্ডীর পারের তিনদিকে নিবিড় বন। এ বনে বড় বড় বনস্পতির নিবিড় সমাবেশ—জলের সান্নিধ্যবশতই হোক বা যে জন্যই

হোক, বনের তলদেশে নানা বিচিত্র লতাপাতা বন্য পুষ্পের ভিড়। এই বন বিশাল সরস্বতী কুণ্ডীর নীল জলকে তিনদিকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। একদিকে ফাঁকা—সেখান হইতে পূর্বদিকের বহুদূর প্রসারিত নীল আকাশ ও দূরের শৈলমালা চোখে পড়ে। বামে চাহিলে গভীর হইতে গভীরতর বনের মধ্যে দৃষ্টি চলিয়া গিয়া ঘন নিবিড় শ্যামলতার মধ্যে নিজেকে নিজে হারাইয়া ফেলে। দক্ষিণে চাহিলে স্বচ্ছ নীল জলের ওপারে সুদূরবিসর্পী আকাশ ও অস্পষ্ট শৈলমালার ছবি মনকে বেলুনের মত ফুলাইয়া পৃথিবীর মাটিতে উড়াইয়া লইয়া চলে।

হ্রদের তীরের নিবিড় বন প্রায় তিন মাইলের উপর লম্বা, গভীরতায় প্রায় দেড় মাইল। জলের ধার দিয়া বনের গাছপালার ছায়ায় ছায়ায় একটা সুঁড়ি পথ বনের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত আসিয়াছে—এই পথ ধরিয়া বেড়াইতাম। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে সরস্বতীর নীল জল, তার উপর উপুড় হইয়া-পড়া দূরের আকাশটা এবং দিগন্তলীন শৈলশ্রেণী চোখে পড়িত। ঝির্ ঝির্ করিয়া স্নিগ্ধ হাওয়া বহিত, পাখি গান গাহিত, বন্য ফুলের সুগন্ধ পাওয়া যাইত।

একদিন একটা গাছের ডালে উঠিয়া বসিলাম। সে-আনন্দের তুলনা হয় না। আমার মাথার উপর বিশাল বনস্পতিদলের ঘন সবুজ পাতার রাশি, তার ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশের টুক্‌রা, প্রকাণ্ড একটা লতায় থোকা থোকা ফুল দুলিতেছে। পায়ের দিকে অনেক নীচে ভিজা মাটিতে বড় বড় ব্যাঙের ছাতা গজাইয়াছে। এখানে আসিয়া বসিয়া শুধু ভাবিতে ইচ্ছা হয়। প্রত্যেক বৃক্ষলতার হৃৎস্পন্দন যেন নিজের বুকের রক্তের শান্ত স্পন্দনের মধ্যে অনুভব করা যায়। স্তব্ধ দুপুরে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এখানে তীর-তরুর ছায়ায় বসিয়া পাখির কূজন শুনিতে শুনিতে মন কতদূরে কোথায় চলিয়া যাইত, বন্য নিমগাছের সুগন্ধি নিমফুলের সুবাস ছড়াইত বাতাসে, জলে জলজ লিলির দল ফুটিত।

সেদিন ফিরিতেছিলাম বেলা তিনটার সময়। খররৌদ্রে বিস্তীর্ণ রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর পার হইয়া ঘর্মাক্ত কলেবরে বনের মধ্যে ঢুকিয়া ঘন ছায়ায় ছায়ায় জলের ধার পর্যন্ত গেলাম। একটা গাছের ডালে ঘোড়া

বাঁধিয়া নিবিড় ঝোপের তলায় একখানা অয়েলক্লথ পাতিয়া একেবারে শুইয়া পড়িলাম। ঘন ঝোপের ডালপালা চারিধার হইতে এমনভাবে আমায় ঢাকিয়াছে যে বাহির হইতে আমায় কেউ দেখিতে পাইবে না। একটা কি গাছ হইতে হাতখানেক লম্বা বড় বড় বনসিমের মত সবুজ ফল আমার প্রায় বুকের উপর দুলিতেছে। আর একটা কি গাছ, তার ডালপালা প্রায় অর্ধেক ঝোপটা জুড়িয়া, তাহাতে কুচো কুচো ফুল ধরিয়াছে, ফুলগুলি এত ছোট যে কাছে না গেলে চোখে পড়ে না—কিন্তু কি ঘন, নিবিড় সুবাস সে-ফুলের।

সরস্বতী কুণ্ডীর বন পাখির আড্ডা। এত পাখিও আছে এখানকার বনে! কত ধরনের, কত রংবেরঙের পাখি—শ্যামা, শালিক, হরটিট্, বনটিয়া, চড়াই, ছাতারে, ঘুঘু, হরিয়াল। উঁচু গাছের মাথায় বাজবৌরী, চিল, কুল্লো—সরস্বতীর নীল জলে বক, সিল্লী, রাঙা হাঁস, মাণিকপাখি, কাক প্রভৃতি জলচর পাখি—পাখির কাকলিতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে ঝোপের উপরটা, কি বিরক্তই করে তারা তাদের উল্লাসভরা অবাক কূজনে কানপাতা দায়। অনেক সময় মানুষকে গ্রাহ্যই করে না, আমি শুইয়া আছি দেখিতেছে, আমার চারিপাশে হাত দেড়-দুই দূরে তাহারা ঝুলন্ত ডালপালায় লতায় বসিয়া কিচ্ কিচ্ করিতেছে—আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপও নাই।

এখানেই এদিন প্রথম বন্য হরিণ দেখিলাম। শুইয়া আছি—হঠাৎ কিসের পায়ের শব্দে উঠিয়া বসিয়া মাথার শিয়রের দিকে চাহিয়া দেখি ঝোপের নিভৃততর দুর্গমতর অঞ্চলে নিবিড় লতাপাতার জড়াজড়ির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে একটা হরিণ। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি, বড় হরিণ নয়, হরিণশাবক। খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল, দুজনেই নির্বাক, নিস্পন্দ। হরিণ-শিশুটির চোখে ঠিক যেন মনুষ্যশিশুর মত সাগ্রহ কৌতূহলের দৃষ্টি। আরও কাছে আসিত কিনা জানি না। আমার ঘোড়াটা সে সময় হঠাৎ পা নাড়িয়া গা ঝাড়া দিয়া ওঠাতে হরিণশিশু চকিত ও সন্ত্রস্তভাবে ঝোপের মধ্য দিয়া দৌড়াইয়া তাহার মায়ের কাছে সংবাদটা দিতে গেল।

রোদ ক্রমশ রাঙা হইয়া আসিল। ওপারে শৈলচূড়ায় যেন তামার রং ধরিয়াছে। বকের দল ডানা মেলিয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। গাছপালার মগডালে রোদ উঠিয়া গেল। পাখির কূজন বাড়িল, আর বাড়িল অজানা বনকুসুমের সেই সুঘ্রাণটা। অপরাহ্নের ছায়ায় গন্ধটা যেন আরও ঘন, আরও সুমিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একটা বেজি খানিক দূর হইতে মাথা উঁচু করিয়া আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছে।

কি নিভৃত শান্তি! কি অদ্ভুত নির্জনতা! এতক্ষণ তো এখানে আছি, সাড়ে তিনঘণ্টার কম নয়—বন্য পাখির কাকলি ছাড়া আর কোন শব্দ শুনি নাই, আর পাখিদের পায়ে ডালপাতার মচমচানি, শুষ্কপত্র বা লতার টুক্‌রা পতনের শব্দ। মানুষের চিহ্ন নাই কোনদিকে।

নানা বিচিত্র ও বিভিন্ন গড়ন বনস্পতিদের শীর্ষদেশের! এই সন্ধ্যার সময় রাঙা রোদ পড়িয়া তাদের শোভা হইয়াছে অদ্ভুত। তাদের কত গাছের মগডাল জড়াইয়া লতা উঠাইয়াছে। এক ধরনের লতাকে এ[illegible]শে বলে ভিঁয়োরা লতা—আমি তাহার নাম দিয়াছি ভোম্‌রা লতা। এই সময় ভোম্‌রা লতায় ফুল ফোটে—ছোট ছোট বনজুঁইয়ের মত সাদা ফুলে কত বড় গাছের মাথা আলো করিয়া রাখিয়াছে। অতি চমৎকার সুঘ্রাণ, অনেকটা যেন সর্ষে ফুলের মত—তবে অতটা উগ্র নয়।

সরস্বতী কুণ্ডীর বনে কত বন্য শিউলি গাছ—শিউলি গাছের প্রাচুর্য এক এক জায়গায় এত বেশি, যেন মনে হয় শিউলির বন। বড় বড় শিলাখণ্ডের উপর শরতের প্রথম সকালবেলা রাশি রাশি শিউলি ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছিল—দীর্ঘ এক রকম কর্কশ ঘাস সেই সব পাথরের আশে পাশে—বড় বড় ময়না-কাঁটার গাছ তার সঙ্গে জড়াইয়াছে—কাঁটা ঘাস, শিলাখণ্ড সব তাতেই রাশি রাশি শিউলি ফুল—আর্দ্র, ছায়াগহন স্থান, তাই সকালের ফুল এখনও শুকাইয়া যায় নাই।

অনুশীলনী

□ **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**

১।। সরস্বতী কুণ্ডীর তিনদিকে যে নিবিড় বন আছে তার একটি বর্ণনা দাও।

২ ॥ বনের মধ্যে গাছের ডালে বসে লেখক যে আনন্দ উপভোগ করে-ছিলেন তার বর্ণনা দাও।

৩ ॥ বনের মধ্যে হরিণশাবক দেখে লেখকের কি অনুভূতি হয়েছিল ?

৪ ॥ সরস্বতী কুণ্ডীর বনে লেখক যেসব পাখি দেখেছেন তার একটি বর্ণনা দাও।

৫ ॥ হ্রদ অঞ্চলের অপরাহ্নকালীন সৌন্দর্যের একটি বর্ণনা দাও।

৬ ॥ সরস্বতী কুণ্ডীর বনে বন্য শিউলির শোভার বর্ণনা দাও।

□ আলোচনামূলক সংক্ষিপ্ত / মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১ ॥ 'একদিন একটা গাছের ডালে উঠিয়া বসিলাম।'—গাছের ডালে বসে লেখক কি দেখলেন ?

২ ॥ 'সেদিন ফিরিতেছিলাম বেলা ৩টার সময়।'—ওই সময় লেখকের কি অভিজ্ঞতা হয়েছিল ?

৩ ॥ সরস্বতী কুণ্ডীর বনে পাখির আড্ডার বর্ণনা দাও।

৪ ॥ 'এইখানেই একদিন প্রথম বন্যহরিণ দেখিলাম'।—লেখকের হরিণ দেখার অভিজ্ঞতাটি বর্ণনা করো।

৫ ॥ 'আমি তাহার নাম দিয়াছি ভোম্‌রা লতা।'—ভোম্‌রা লতার বর্ণনা দাও।





লেখক ঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ঔপন্যাসিক এবং ছোট গল্পকারদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রগণ্য। জন্ম : ১৮৯৮ ; মৃত্যু : ১৯৭৩। জন্মস্থান : বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রাম। গ্রামবাংলা এবং গ্রামবাংলার মানুষের অত্যন্ত বাস্তব এবং দ্বন্দ্ব-মুখর জীবন, পরিবেশ, সমসাময়িক রাজনীতি, বিবিধ সমস্যা তারাশঙ্করের উপন্যাসের বিষয়বস্তু। লেখকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যে গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, ধাত্রীদেবতা, নাগিণীকন্যার কাহিনী, কালিন্দী, হাঁসুলী-বাঁকের উপকথা, সন্দীপন পাঠশালা, আরোগ্য নিকেতন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লেখক শরৎ-স্মৃতি পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রভৃতি লাভ করেছিলেন। □

উৎস ঃ "মানুষ ও পশু" গল্পটি তাঁর 'গল্প সংগ্রহ' থেকে সঙ্কলিত হয়েছে। □

রচনা-সম্পর্কে ঃ 'মানুষ ও পশু' কাহিনীতে একটি মূক, নিরীহ পশুর আবেগ ও অনুরাগের ভাবটি লেখকের বর্ণনাগুণে একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মানুষ ও পশুর মধ্যে প্রীতি-সহানুভূতির সম্পর্ক যে কতো নিবিড় হতে পারে তার পরিচয় এই গল্পটিতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ভাষার সারল্য, বর্ণনার সাবলীলতা গল্পটির প্রধান আকর্ষণ। □

কেলে চার বছরে মস্ত হয়ে উঠল। দুখানা সুন্দর খণ্ড তয়ের ৎ এর মত শিঙ বের হল। দুটিই এক রকম। গায়ের রোঁয়া চিকন হল—রোদে চিকচিক করত। কপালের চাঁদটি প্রশস্ত হল, একফালি চাঁদের মত।

চিনু মণ্ডল মশায় ভাল দিন দেখে কেলেকে লাঙলে 'গতালেন'—অর্থাৎ প্রথম লাঙলে জুতলেন। কিন্তু বিপদ হল—মণ্ডল মশায়ের বলদগুলো থেকে কেলের কাঁধ উঁচু। তবুও সুকৌশলে জুতলেন—নিজ হাতে লাঙল ধরলেন। তখন লাঙল তিনি আর ধরতেন না বড় একটা। ছেলেরা আপত্তি করত। বড় ছেলে সেবার ল ফাইন্যাল দেবে—ছোট দেবে ওভারশিয়ারী পরীক্ষা। ছেলেদের বিয়ে হয়েছে বড় বড় সদ্গোপদের ঘরে। বড় ছেলের শ্বশুর জমিদার। ছোট ছেলের শ্বশুর সরকারী চাকরী করে। লাঙল ধরলে কুটুমদের মাথা হেঁট হয়—এই কারণে তিনি লাঙল বড় ধরতেন না। মাঠে লোকজন বিশেষ না থাকলে কৃষাণদের বলতেন,—দে একবার মুঠো আমাকে দে!

সে দিন প্রকাশ্যেই ধরলেন।

কেলে লাফাতে শুরু করেছিল—জমিতে বসে পড়েছিল। কাঁধ নামিয়ে ঝাঁকি দিয়ে জোয়াল ফেলে দিয়েছিল। কিছুতেই জোয়াল নেবে না। কাঁধ সুড়-সুড় করেছে প্রথমটা—তারপর ব্যথা করেছে।

চিনু মণ্ডল আদর করেছেন! মুখে হাত বুলিয়েছেন, বলেছেন,—ছি! দুষ্টুমি করে না!

না। কেলে ঘাড় নেড়েছে, শিঙ নেড়েছে।

চিনু মণ্ডল মেরেছেন। কেলে মার খেয়ে পিঠ কুঁজো করেছে। তারপর থপ্ করে বসে পড়েছে। কিছুতেই উঠবে না।

চিনু মণ্ডল রেগে এসে লেজ ধরে এমন টান মেরেছেন যে ধড়মড় করে কেলে উঠে দাঁড়িয়েছে।

চিনু মণ্ডল নিজের হাতে তাকে বশ করলেন লাঙলে। লাঙলে বশ করা সোজা কথা নয়। যে লাঙল ধরে সে একটু অসতর্ক হলেই—লাঙলের ফাল গরুর পিছনের পায়ে বিঁধে খোঁড়া করে দেয়।

পুরো বছরটা পরিশ্রম করে যখন কেলেকে লাঙলে বশ করলেন, তখন কেলে হয়ে উঠল জুড়িহীন! অন্য বলদেরা তার সঙ্গে বইতে অক্ষম হয়ে গেল। চিনু বলতেন,—বেটা আমার বাঘ রে!

কেলে তার কোলের কাছে এসে দাঁড়াত। তিনি আদর করে

গলকম্বলে হাত বুলিয়ে দিতেন—কেলে আরও গা ঘেঁষে আসত। জিভ দিয়ে মুখ চাটত। হুঁ-হুঁ শব্দ করত; চিনু বলতেন—কেলে ? বুড়ো মদ্দ আর কোলে নিতে পারি আমি? বেকুব কোথাকার! যাঃ—।

কেলে শিঙ নাড়ত—না।

মণ্ডল বেশ কিছুক্ষণ দু হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতেন। কেলে তাতেই খুশী হত।

১৩৫৪ সালে—১৯৪৭ সালে চিনু মণ্ডল পড়লেন অসুখে। টাইফয়েড হল। মণ্ডলবাড়ীতে সে একটা দুঃসময়। লোকে বললে,—চার চৌরষ মুখ; এ সয় না।

তাই বটে! চুয়ান্ন সালে চিনু মণ্ডলের ভাগ্য যেন চৌরষ। অর্থাৎ চারিদিকে সমান প্রশস্ত এবং সমতল মসৃণ। কোথাও কাঁটা খোঁচ ছিল না। দুই ছেলে পরীক্ষা দিলে। তারপর শ্রাবণ মাসে শেখ পাড়ার মিয়াদের বিশ বিঘে ধানসুদ্ধ জমি পুকুর—সব কিনলেন।

মিয়া সাহেবদের সম্পত্তির দাম কম নয়—সে পঁচিশ হাজার টাকা। মিয়া সাহেবরা পাকিস্তান চলে গেলেন সব বেচে।

চিনু মণ্ডল মজুত ধান সব বিক্রি করলেন, বউদের গহনা নিয়ে বন্ধক দিলেন, নিজের জমি বন্ধক রেখেও টাকা সংগ্রহ করলেন। তারপরই নিজে পড়লেন টাইফয়েডে। সে যমে মানুষে টানাটানি। আটাশ দিন। তারপর জ্বর ছাড়ল। আরও মাসখানেক পরে লাঠি ধরে বাইরে এলেন। সব দেখলেন—হ্যাঁ ঠিক আছে। কিন্তু গোয়ালবাড়ীতে এসে দেখলেন—কেলে নাই।

মণ্ডল জিজ্ঞাসা করলেন,—জিতে, কেলে কই?

জিতে রাখাল। সে চুপ করে রইল।

মণ্ডল বললেন,—জিতে!

জিতে বললে,—আজ্ঞেন ?

—কালা হয়েছিস, শুনতে পাস না? কেলে কই ?

—সি আজ্ঞেন বড়বাবুকে শুধান।

—বড়বাবুকে শুধান কি ? তুই বলতে পারিস না ? কেলে কই ?

মাথা চুলকে জিতে বললে, সি দিনে—আপনাকার যখন খুব অসুখ—বড় ডাক্তার এল বর্ধমান থেকে, সি দিনে—

—কী সি দিনে ?

—সি দিনে পাইকের ডেকে—কেলেকে পাঁচশো টাকায়—

—কে-লে-কে, পাঁচশো টাকায়—কি করেছে, বেচে দিয়েছে !

—হ্যাঁ।

সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী। তিনি বললেন,—সে দিন ঘরে টাকা নেই, গোলায় ধান নেই। বউমাদের গয়না বন্ধক পড়ে আছে। কী করবে বল। পাইকেরটা এসে দাঁড়িয়ে দেখছিল কেলেকে। সত্য কি করবে ? বললে, কিনবে ?

সে বললে, দেবেন ? সত্য বললে, কত দাম দেবে ? সে বললে, চার শো।

সত্য বলতে হয় বললে, পাঁচ শো। লোকটা তখুনি গুনে টাকা দিয়ে চলে গেল। সেই টাকাতে তোমার চিকিৎসা হল, ডাক্তার এল। নইলে—বলে চুপ করে গেলেন চিনু মণ্ডলের স্ত্রী।

চিনু মণ্ডল বসে পড়েছিলেন সেইখানে। কাঁদতে শুরু করেছিলেন। হাউহাউ করে নয়, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন সেদিন।

তারপর তিনি অনেক খোঁজ করেছিলেন কেলের কিন্তু কোন হদিস করতে পারেন নি। খোঁজে খোঁজে পাকুড়ের কাছে হিরণপুরের হাট অবধি পৌঁছে সব হদিস হারিয়ে গিয়েছিল। হিরণপুরের হাটে কে তাকে কিনেছিল, তার ঠিকানা পান নি। তারপর আজ চৌদ্দ বছর পার হয়ে গেছে। চিনু মণ্ডলের ছেলেরা মোটর কিনেছে। চিনু মণ্ডলও চাষের জন্য বড় বড় বলদ কিনেছেন—এক একটার দাম সাতশো আটশো। কেলেকেও ভুলে গিয়েছেন একরকম। আজ এই পথের মধ্যে মোটর খারাপ হওয়ায় পথের ধারে বসে আছেন, পাইকাররা কেনা বুড়ো গরুর পাল নিয়ে কসাইখানায় চলেছে—তার মধ্যে থেকে বৃদ্ধ অথর্ব কঙ্কালসার কেলে তাঁকে চিনে তাঁর কাছে এসে তাঁর গা শুকছে,

জিভ দিয়ে তাঁর মুখ চাটছে, মাথা চাটছে, হাম্বা শব্দে ডাকছে—কী বলছে?

—ওরে কেলে কী বলছিস? বলছিস—দেখ আমার দশা দেখ?

হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন চিনু মণ্ডল মহাশয়।

—তোকে কসাইখানায় নিয়ে যাবে?

বড়ছেলে সত্যবাবু বললেন,—না! আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে, আবার যাবে কেন? যাবে না।

পাইকারটা ব্যাপার খানিকটা আন্দাজ করেছিল। সুবিধে পেয়ে দর হেঁকে ছিল দুশো টাকা। তখন নাকি চামড়া মাংস হাড়ের দাম তিন ডবল।

সত্যবাবু তাই দিয়েছিলেন।

অনুশীলনী

□ **বিষয়মুখী প্রশ্ন :**

১ ॥ চিনু মণ্ডল ও কেলের সম্পর্কটি কেমন নিবিড় ছিল তা 'মানুষ ও পশু' গল্পটি অবলম্বন করে বর্ণনা করো।

২ ॥ 'সেদিন প্রকাশ্যেই ধরলেন।'—কে, কোন্ দিন, কাকে, কিভাবে ধরলেন, বুঝিয়ে বলো।

৩ ॥ চিনু মণ্ডল কিভাবে কেলেকে বশ করে লাঙ্গলে জুতলেন?

৪ ॥ 'বেটা আমার বাঘ রে!' —কে কার সম্পর্কে এই উক্তি করেছেন? তিনি কিভাবে 'বেটাকে' আদর করতেন?

৫ ॥ লোকে বললে,—'চার চৌরষ মুখ, এ সয়না।'— 'চার চৌরষ মুখ' কথাগুলির অর্থ কি? লোকের কথা চিনু মণ্ডলের জীবনে কিভাবে সত্য হয়েছিল?

৬ ॥ 'চিনু মণ্ডল বসে পড়েছিলেন সেইখানে'। —কেন? তখন তাঁর মনের অবস্থা কিরকম হয়েছিল?

৭ ॥ 'হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন ....' কে, কোন্ অবস্থায়; কেন কাঁদতে লাগলেন?

৮ ।। 'খণ্ড তয়ের মত' এবং 'একফালি চাঁদের মত'—কোন্ প্রসঙ্গে উপমা দুটি প্রয়োগ করা হয়েছে ?

৯ ।। পিতা 'চিনু মণ্ডল' এবং পুত্র 'সত্যবাবু'র পরিচয় দাও।

□ আলোচনামূলক সংক্ষিপ্ত / মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১ ।। চার বছরের কেলের চেহারার বর্ণনা দাও।

২ ।। 'ছেলেরা আপত্তি করত।' —কোন্ ব্যাপারে ? কেন ?

৩ ।। কোন্ দিন চিনু মণ্ডল লাঙল ধরতেন ?

৪ ।। 'নিজের হাতে তাকে বশ করলেন লাঙলে।'—কে, কাকে, কিভাবে বশ করলেন ?

৫ ।। 'তখন কেলে হয়ে উঠল জুড়িহীন।' —কবে ? 'জুড়িহীন' বলতে কি বোঝানো হয়েছে ?

৬ ।। 'কেলে নাই।'—কেলে 'নাই' কেন ?

৭ ।। 'তখন নাকি চামড়া মাংস হাড়ের দাম তিন ডবল।'—কথাগুলোর অর্থ বুঝিয়ে দাও।





লেখক ঃ বাংলা শিশু-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ও ছড়াকার। জন্ম—১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে। পিতা বিখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। লেখকের বিখ্যাত গ্রন্থ ঃ আবোল-তাবোল, হ য ব র ল, পাগলা দাস্থ প্রভৃতি। এই বছরটিতে লেখকের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব চলেছে। □

উৎস ঃ 'বেজায় গরমে' রচনাংশটি সুকুমার রায়ের 'হ য ব র ল' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। □

রচনা-সম্পর্কে ঃ সুকুমার রায় শিশুদের জন্য যা লিখতেন, তা বড়োদের কাছেও সমান উপভোগ্য হয়ে উঠত। তাঁর লেখা গল্প ছড়া ও কবিতাগুলি সরস, উজ্জ্বল এবং কৌতুকজনক। 'হ য ব র ল' গ্রন্থটি আপাতভাবে 'নন-সেন্স' বলে মনে হলেও এর ভিতরে আশ্চর্য সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি, হাস্যরস-রসিকতা, নিপুণ সংলাপ-রচনা দেখতে পাওয়া যায়। এধরনের বই বাংলা ভাষায় দ্বিতীয়টি আর নেই। 'বেজায় গরমে' রচনাংশে লেখকের সূক্ষ্ম রসবোধ, হাস্যরস-রসিকতা এবং নিপুণ সংলাপসৃষ্টির চমৎকার পরিচয় মিলবে। □

বেজায় গরম। গাছতলায় দিব্যি ছায়ার মধ্যে চুপচাপ শুয়ে আছি, তবু ঘেমে অস্থির। ঘাসের উপর রুমালটা ছিল ; ঘাম মুছবার জন্য যেই সেটা তুলতে গিয়েছি অমনি রুমালটা বলল, 'ম্যাঁও!' কি আপদ! রুমালটা ম্যাঁও করে কেন?

চেয়ে দেখি রুমালটা তো আর রুমাল নেই, দিব্যি মোটা সোটা লাল

টক্‌টকে একটা বেড়াল গোঁফ ফুলিয়ে প্যাট্ প্যাট্ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি বললাম, 'কি মুশকিল! ছিল রুমাল, হয়ে গেল একটা বেড়াল।'

অমনি বেড়ালটা বলে উঠল, 'মুশকিল আবার কি? ছিল একটা ডিম, হয়ে গেল দিব্যি একটা প্যাঁকপেঁকে হাঁস। এ তো হামেশাই হচ্ছে।'

আমি খানিক ভেবে বললাম, 'তাহলে তোমায় এখন কি বলে ডাকব? তুমি তো সত্যিকারের বেড়াল নও, আসলে তুমি হচ্ছ রুমাল।'

বেড়াল বলল, 'বেড়ালও বলতে পার, রুমালও বলতে পার, চন্দ্রবিন্দুও বলতে পার।' আমি বললাম, 'চন্দ্রবিন্দু কেন?'

শুনে বেড়ালটা 'তাও জানো না?' ব'লে একচোখ বুজে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে বিশ্রী রকম হাসতে লাগল। আমি ভারি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম! মনে হল, ঐ চন্দ্রবিন্দুর কথাটা নিশ্চয় আমার বোঝা উচিত ছিল। তাই থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম, 'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।'

বেড়ালটা খুশি হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এ তো বোঝাই যাচ্ছে—চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের তালব্য শ, রুমালের মা—হল চশমা। কেমন, হল তো?'

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, কিন্তু পাছে বেড়ালটা আবার সেই রকম বিশ্রী করে হেসে ওঠে, তাই সঙ্গে সঙ্গে হুঁ হুঁ করে গেলাম। তারপর বেড়ালটা খানিকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল, 'গরম লাগে তো তিব্বত গেলেই পার।' আমি বললাম, 'বলা ভারি সহজ, কিন্তু বললেই তো আর যাওয়া যায় না!'

বেড়াল বলল, 'কেন? সে আর মুশকিল কি?' আমি বললাম, 'কি করে যেতে হয় তুমি জানো?'

বেড়াল এক গাল হেসে বলল, 'তা আর জানিনে? কলকেতা, ডায়মণ্ডহারবার, রাণাঘাট, তিব্বত, বাস্! সিধে রাস্তা, সওয়া ঘণ্টার পথ, গেলেই হল।'

আমি বললাম, 'তাহলে রাস্তাটা আমায় বাতলে দিতে পার?'

শুনে বেড়ালটা হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'উহুঁ, সে আমার কম্ম নয়। আমার গেছোদাদা যদি থাকত, তাহলে সে ঠিক ঠিক বলতে পারত।'

আমি বললাম, 'গেছোদাদা কে? তিনি থাকেন কোথায়?' বেড়াল বলল, 'গেছোদাদা আবার কোথায় থাকবে? গাছেই থাকে।'

আমি বললাম, 'কোথায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়?' বেড়াল খুব জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, 'সেটি হচ্ছে না, সে হবার যো নেই।'

আমি বললাম, 'কি রকম?'

বেড়াল বলল, 'সে কি রকম জানো? মনে কর তুমি যাবে উলুবেড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, তখন তিনি থাকবেন মতিহারি। মতিহারি যাও, তাহলে শুনবে তিনি আছেন রামকিষ্টপুর। আবার সেখানে গেলে দেখবে তিনি গেলেন কাশিমবাজার। কিছুতেই দেখা হবার যো নেই।'

আমি বললাম, 'তাহলে তোমরা কি করে দেখা কর?' বেড়াল বলল, 'সে অনেক হাঙ্গামা। আগে হিসেব করে দেখতে হবে, দাদা কোথায় কোথায় নেই; তারপর হিসেব করে দেখতে হবে, দাদা কোথায় কোথায় থাকতে পারে; তারপর দেখতে হবে, দাদা এখন কোথায় আছে। তারপর দেখতে হবে, সেই হিসেব মতো যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছবে, তখন দাদা কোথায় থাকবে। তারপর দেখতে হবে—,

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, 'সে কি রকম হিসেব?'

বেড়াল বলল, 'সে ভারি শক্ত। দেখবে কি রকম?' এই বলে সে একটা কাঠি দিয়ে ঘাসের উপর লম্বা আঁচড় কেটে বলল, 'এই মনে কর গেছোদাদা।' বলেই খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে চুপ করে বসে রইল।

তারপর আবার ঠিক তেমনি একটা আঁচড় কেটে বলল, 'এই মনে কর চন্দ্রবিন্দু।' এমনি করে খানিকক্ষণ কি ভাবে আর একটা করে লম্বা আঁচড় কাটে, আর বলে, 'এই মনে কর তিব্বত'—'এই মনে কর গেছোবৌদি রান্না করছে'—'এই মনে কর গাছের গায়ে একটা ফুটো—'

এই রকম শুনতে শুনতে শেষটায় আমার কেমন রাগ হয়ে গেল।

আমি বললাম, 'দূর ছাই! কি সব আবোল-তাবোল বকছে, একটুও ভালো লাগে না।'

বেড়াল বলল, 'আচ্ছা তাহলে আর একটু সহজ করে বলছি। চোখ বোজ, আমি যা বলব, মনে মনে তার হিসেব কর।' আমি চোখ বুজলাম।

চোখ বুজেই আছি, বুজেই আছি, বেড়ালের আর কোন সাড়াশব্দ নেই। হঠাৎ কেমন সন্দেহ হল, চোখ চেয়ে দেখি বেড়ালটা ল্যাজ খাড়া করে বাগানের বেড়া টপকিয়ে পালাচ্ছে আর ক্রমাগত ফ্যাচ ফ্যাচ করে হাসছে।

কি আর করি, গাছতলার একটা পাথরের উপর বসে পড়লাম। বসতেই কে যেন ভাঙা ভাঙা মোটা গলায় বলে উঠল, 'সাত দুকুনে কত হয়?'

আমি ভাবলাম, এ আবার কে রে? এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, এমন সময় আবার সেই আওয়াজ হল, 'কই জবাব দিচ্ছ না যে? সাত দুগুণে কত হয়? তখন উপরদিকে তাকিয়ে দেখি একটা দাঁড়াকাক শ্লেটে পেনসিল দিয়ে কি যেন লিখছে, আর এক একবার ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

আমি বললাম, 'সাত দুগুণে চোদ্দ।'

কাকটি অমনি দুলে দুলে মাথা নেড়ে বলল, 'হয়নি, হয়নি, ফেল্।'

আমার ভয়ানক রাগ হল! বললাম, 'নিশ্চয় হয়েছে। সাতেক্কে সাত, সাত দুকুনে চোদ্দ, তিন সাত্তে একুশ।'

কাকটা কিছু জবাব দিল না, খালি পেনসিল মুখে দিয়ে খানিকক্ষণ কি যেন ভাবল।

তারপর বলল, 'সাত দুগুণে চোদ্দর নামে চার, হাতে রইল পেনসিল।'

আমি বললাম, 'তবে যে বলছিলে সাত দুগুণে চোদ্দ হয় না? এখন কেন?

কাক বলল, 'তুমি যখন বলছিলে, তখনো পুরো চোদ্দ হয় নি। তখন

ছিল, তেরো টাকা চোদ্দ আনা তিন পাই। আমি যদি ঠিক সময়ে বুঝে ধাঁ করে চোদ্দ লিখে না ফেলতাম, তাহলে এতক্ষণে হয়ে যেত চোদ্দ টাকা এক আনা নয় পাই।'

আমি বললাম, 'এমন আনাড়ি কথা তো কখনো শুনিনি। সাত দুগুণে যদি চোদ্দ হয়, তা সে সব সময়েই চোদ্দ। একঘণ্টা আগে হলেও যা, দশদিন পরে হলেও তাই।'

কাকটা ভারি অবাক হয়ে বলল, 'তোমাদের দেশে সময়ের দাম নেই বুঝি ?'

আমি বললাম, 'সময়ের দাম কি রকম ?'

কাক বলল,'এখানে কদিন থাকতে, তাহলে বুঝতে। আমাদের বাজারে সময় এখন ভয়ানক মাগ্যি, এতটুকু বাজে খরচ করবার যো নেই। এই তো কদিন খেটেখুটে চুরি-চামারি করে খানিকটা সময় জমিয়েছিলাম, তাও তোমার সঙ্গে তর্ক করতে অর্ধেক খরচ হয়ে গেল।' বলে সে আবার হিসেব করতে লাগল। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বসে রইলাম।

অনুশীলনী

□ বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১॥ রুমালটা কিভাবে বিড়াল হয়ে গেল ? বক্তার সঙ্গে বিড়ালের কি কথাবার্তা হল ?

২॥ গেছো-দাদা কে ? গেছো-দাদার সঙ্গে বক্তার কি কথাবার্তা হয়েছিল, গুছিয়ে বলো।

৩॥ কাকের সঙ্গে বক্তার কথোপকথন বর্ণনা করো।

□ আলোচনামূলক / সংক্ষিপ্ত মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১॥ ডায়মণ্ডহারবার কোথায় ?

২॥ তিব্বত কোথায় ?

৩॥ মতিহারি কোন্ রাজ্যে অবস্থিত ?

৪॥ কাকটি কিভাবে অংক কষেছিল ?



ক্যামোফ্লেজ

— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

লেখক ঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (জন্ম : ১৯১৮ ; মৃত্যু : ১৯৭০) আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রধানত গল্পকার হিসাবে বিখ্যাত। উপন্যাস-লেখক হিসাবেও তাঁর স্থান উঁচুতে। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'উপনিবেশ'। ইতিহাস, টোপ, হাড় প্রভৃতি তাঁর শ্রেষ্ঠ ছোটো গল্প। □

উৎস ঃ সঙ্কলিত 'ক্যামোফ্লেজ' গল্পটি লেখকের 'সমগ্র কিশোর সাহিত্যে'র অন্তর্গত। □

রচনা-সম্পর্কে ঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আধুনিক লেখক। তাঁর ভাষা ও স্টাইলে আধুনিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। 'ক্যামোফ্লেজ' গল্পটি তাঁর লেখা টেনিদা-সিরিজের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। গল্পটি ছোটোদের জন্য লেখা ; কিন্তু বড়োদের কাছেও কম উপভোগ্য নয়। হাস্যরসের এক অনাবিল উৎস এই গল্পটি। □

চাটুজ্যেদের রোয়াকে গল্পের আড্ডা জমেছিল। আমি, ক্যাবলা, হাবুল সেন, আর সভাপতি আমাদের পটলডাঙ্গার টেনিদা। একটু আগেই ক্যাবলার পকেট হাতড়ে টেনিদা চারগণ্ডা পয়সা রোজগার করে ফেলেছে, তাই দিয়ে আমরা তারিয়ে তারিয়ে কুল্‌পি বরফ খাচ্ছিলাম।

শুধু হাঁড়ির মতো মুখ করে ক্যাবলা বসে আছে। হাতের শাল-পাতাটার ফাঁক দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় কুল্‌পির রস গড়িয়ে পড়ছে, ক্যাবলা খাচ্ছে না।

টেনিদা হঠাৎ তার বাঘা গলায় হুঙ্কার ছাড়লে, এই ক্যাবলা, খাচ্ছিস না যে ?

ক্যাবলার চোখে তখন জল আসবার জো। সে জবাব দিলে না, শুধু মাথা নাড়ল।

খাবি না? তবে না খাওয়াই ভালো। কুল্‌পি খেলে ছেলেদের পেট খারাপ করে—বলতে না বলতেই থাবা দিয়ে টেনিদা ক্যাবলার হাত থেকে কুল্‌পিটা তুলে নিলে, তারপর চোখের পলক পড়তে না পড়তে সোজা শ্রীমুখের গহ্বরে।

ক্যাবলা বললে, অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ—

—অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ! এর মানে কী? বলি মানেটা কী হল এর? —টেনিদা বজ্রগর্ভ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে।

ক্যাবলা এবারে কেঁদে ফেলল: আমার চার আনা পয়সা তুমি মেরে দিলে, অথচ আমি ভাবছিলাম সিনেমা দেখতে যাব—একটা ভালো যুদ্ধের বই—

যুদ্ধের বই—টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে উঠল: বলি, যুদ্ধের বইতে কী দেখবার আছে র‍্যা? খালি দুড়ুম্ দাড়ুম্, খালি ধুমধড়াক্কা, আর খানিকটা বাহাদুরকা খেল্! যুদ্ধের গল্প যদি শুনতে চাস্ তবে শোন্ আমার কাছে।

তুমি যুদ্ধের কী জানো?—আমি ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলাম।

—কী বললি প্যালা?—টেনিদার হুঙ্কারে আমার পালাজ্বরের পিলে নেচে উঠল: আমি জানিনে? তবে কে জানে শুনি? তুই?

—না, না, আমি আর জানব কোত্থেকে!—আমি তাড়াতাড়ি বললাম: বাসকপাতার রস খাই আর পালাজ্বরে ভুগি, ওসব যুদ্ধ-ফুদ্ধ আমি জানব কেমন করে? তবে বলছিলাম কি না—টেনিদার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি সোজা মুখে ইস্ক্রুপ এঁটে দিলাম।

—কিছুই বলছিলি না। মানে, কখনোই কিছু বলবি না—টেনিদা চোখ দিয়েই যেন আমাকে একটা পেল্লায় রদ্দা কষিয়ে দিলে: ফের যদি যুদ্ধের ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছিস তবে ক্রুদ্ধ হয়ে নাকের ডগায় এমন একটি মুগ্ধবোধ বসিয়ে দেব যে, সোজা বুদ্ধদেব হয়ে যাবি—বুঝলি? মানে মিউজিয়ামে নাকভাঙা বুদ্ধদেব দেখেছিস্ তো, ঠিক সেই রকম।

আতঙ্কে আমি একেবারে ল্যাম্প-পোস্ট্ হয়ে গেলাম।

টেনিদা গলা ঝেড়ে বললে, আমি যখন যুদ্ধে যাই—মানে বার্মা ফ্রণ্টে যেবার গেলাম—

খুক-খুক করে একটা চাপা আওয়াজ। হাবুল সেন হাসি চাপতে চেষ্টা করছে

—হাসছিস্ যে হাবলা ?—টেনিদা এবার হাবুলের দিকে মনোনিবেশ করলে।

মুহূর্তে হাবুল ভয়ে পানসে মেরে গেল। তোত্‌লিয়ে বললে, এই ন্-ন্-না, ম্-মানে, ভাবছিলাম তুমি আবার কবে যু-যু-যুদ্ধে গেলে—

টেনিদা দারুণ উত্তেজনায় রোয়াকের সিমেন্টের উপর একটা কিল বসিয়ে দিয়ে উঃ উঃ করে উঠল। তারপর সেটাকে সামলে নিয়ে চীৎকার করে বললে, গুরুজনের মুখে মুখে তক্কো! ওই জন্যেই তো দেশ আজও পরাধীন! বলি, আমি যুদ্ধে যাই না যাই তাতে তোর কী? গল্প চাস্ তো শোন্, নইলে স্রেফ ভাগাড়ে চলে যা। তোদের মতো বিশ্ববকাটে-দের কিছু বলতে যাওয়াই ঝকমারি।

—না, না, তুমি বলে যাও, আর আমরা তর্ক করব না। হাবুল সভয়ে আত্মসমর্পণ করল।

টেনিদা কুল্‌পির শালপাতাটা শেষ বার খুব দরদ দিয়ে চেটে নিলে, তারপর সেটাকে তালগোল পাকিয়ে ক্যাবলার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললে, তবে শোন্—

আমি তখন যুদ্ধ করতে করতে আরাকানের এক দুর্গম পাহাড়ী জায়গায় চলে গেছি। জাপানীদের পেলেই এমন করে ঠেঙিয়ে দিচ্ছি যে ব্যাটারা 'ফুজিয়ামা টুজিয়ামা' বলে ল্যাজ তুলে পালাতে পথ পাচ্ছে না। তেরো নম্বর ডিভিশনের আমি তখন কম্যানডার—তিন তিনটে ভিক্টোরিয়া ক্রস্ পেয়ে গেছি।

ক্যাবলা ফস্ করে জিজ্ঞেস করলে, সে ভিক্টোরিয়া ক্রসগুলো কোথায়?

—অত খোঁজে তোর দরকার কী? বলি গল্প শুনবি না বাগড়া দিবি বল তো?

—যেতে দাও, যেতে দাও। অমৃতং ক্যাবলা ভাষিতং। তুমি গল্প চালিয়ে যাও টেনিদা—হাবুল মন্তব্য করলে।

—যুদ্ধ করতে করতে সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছুলাম—যার নাম তোরা কাগজে খুব দেখেছিস্। নামটা ভুলে যাচ্ছি—সেই যে কিসের একটা ডিম—

আমি বললাম, হাঁসের ডিম ?

টেনিদা বললে, তোর মাথা।

ক্যাবলা বললে, তবে কি মুরগীর ডিম ?

টেনিদা বললে, তোর মুণ্ডু।

আমি আবার বললাম, তবে নিশ্চয় ঘোড়ার ডিম। তাও না ? কাকের ডিম, বকের ডিম, ব্যাঙের ডিম—

ক্যাবলা বললে, ঠিক, ঠিক, আমার যেন মনে পড়েছে। বোধ হয় টিক্‌টিকির ডিম—

—অ্যাই, অ্যাই মনে পড়েছে।—টেনিদা এমনভাবে ক্যাবলার পিঠ চাপড়ে দিলে যে ক্যাবলা আর্তনাদ করে উঠল : ঠিক ধরেছিস, টিড্ডিম। ···হ্যাঁ—যা বলছিলাম। টিড্ডিমে তখন পেল্লায় যুদ্ধ হচ্ছে। জাপানী পেলেই পটাপট মেরে দিচ্ছি। চা খেতে খেতে জাপানী মারছি, ঝিমুতে ঝিমুতে জাপানী মারছি, এমন কি যখন ঘুমিয়ে নাক ডাকাচ্ছি তখনো কোন রকমে দু-চারটে জাপানী মেরে ফেলছি !

—নাক ডাকাতে ডাকাতে জাপানী মারা ! সে আবার কী রকম ? —আমি কৌতূহল দমন করতে পারলাম না।

—হে-হে-হে—টেনিদা একগাল হাসল : সে ভারী ইন্টারেস্টিং ! আমার এই কুতুব-মিনারের মতো নাকই দেখেছিস, এর ডাক তো কখনো শুনিস্ নি ! একেবারে যাকে বলে রণ-ডম্বরু ! ওইজন্যেই তো মেজ-কাকা গেল বছর বিলিতী ইঞ্জিনিয়ার ডেকে আমার ঘরটা সাউণ্ড প্রুফ্ করিয়ে নিলে, যাতে বাইরে থেকে ওই আওয়াজ কারো কানে না যায়। তা ছাড়া পাড়ার লোকেও কর্পোরেশনে লেখালেখি করছিল কিনা। একদিন তো পুলিস এসে বাড়ি তচনচ—রোজ রাত্রে এ বাড়িতে মেশিন্

গানের আওয়াজ পাওয়া যায়, নিশ্চয়ই এখানে বে-আইনী অস্ত্রের কারখানা আছে। সে এক কেলেঙ্কারী কাণ্ড। যাক্ সে গল্প আর একদিন হবে।

হ্যা—গল্পটা বলি। রোজ রাত্রে ট্রেঞ্চ থেকে আমার নাকের এমনি আওয়াজ বেরুত যে আর সেন্ট্রি দরকার হত না। জাপানীরা ভাবত, সারা রাত বুঝি মেশিন্ গান চলছে, তাই পাহাড়ের ওপার থেকে তারা আর নাক গলাবার ভরসা পেত না। আমাদের যিনি সুপ্রিম কমাণ্ডার ছিলেন—নাম বোধ হয় মিস্টার বোগাস্—তাঁর মগজে শেষে একটা চমৎকার বুদ্ধি গজালো। তিনি একটা লোক রাখলেন। সে ব্যাটা সারারাত আমার পাশে বসে থাকত আর আমার নাকে একটার পর একটা শিসের গুলি, পাথরের টুকরো যা পারত বসিয়ে দিত। আধ সেকেণ্ডের মধ্যেই দোনালা বন্দুকের ছুটো গুলির মতো সেগুলো ছিটকে বেরিয়ে যেত – কত জাপানী যে ওতে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তার হিসেব নেই।

আমি বিড়-বিড় করে আওড়ালাম : সব গাঁজা !

টেনিদা বিত্যুৎবেগে আমার দিকে ফিরল : কী বললি ?

না, না, বলছিলাম, এই আর কি—আমি সামলে গেলাম: কী মজা !

— হ্যা, সে খুব মজার ব্যাপার। ওই জন্যেই তো একটা ভিক্টোরিয়া ক্রস্ পাই আমি—টেনিদা তার হুর্দান্ত নাকটাকে গণ্ডারের খাঁড়ার মতো সগৌরবে আকাশের দিকে তুলে ধরল।

—তারপর ? এই নাকের জোরেই বুঝি যুদ্ধ জয় হল ?…হাবুল জানতে চাইল।

অনেকটা। জাপানীদের যখন প্রায় নিকেশ করে ছেড়েছি, তখন হঠাৎ একটা বিদিকিচ্ছিরি কাণ্ড হয়ে গেল। আর সেইটেই হল আমাদের আসল গল্প।

—বলো, বলো—আমরা তিনজনে সমস্বরে প্রার্থনা জানালাম।

টেনিদা আবার শুরু করল, আমার একটা কুকুর ছিল। তোদের বাংলা দেশের ঘিয়ে ভাজা নেড়ি কুত্তো নয়, একটা বিরাট গ্রে-হাউণ্ড। যেমন তার গাঁক গাঁক ডাক, তেমনি তার বাঘা চেহারা। আর কী

তালিম ছিল তার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে দু' পায়ে খাড়া হয়ে হাঁটতে পারত। বেচারা অপঘাতে মারা গেল। দুঃখ হয় কুকুরটার জন্যে, তবে বামুনের জন্যে মরেছে, ব্যাটা নির্ঘাৎ স্বর্গে যাবে।

—কি করে মরল ? হাবুল প্রশ্ন করল।

—আরে দাঁড়া না কাঁচকলা। যত সব ব্যস্তবাগীশ, আগে থেকেই ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে গল্পটা মাটি করে দিচ্ছে।

যাক, যা বলছিলাম। একদিন বিকেলবেলা, হাতে তখন কোনো কাজ নেই—আমি সেই কুকুরটাকে সঙ্গে করে বেড়াতে বেরিয়েছি। পাহাড়ী জঙ্গলে বেড়াচ্ছি হাওয়া খেয়ে। দুদিন আগেই জাপানী ব্যাটারা ওখান থেকে সরে পড়েছে, কাজেই ভয়ের কোনো কারণ ছিল না। কুকুরটা আগে আগে যাচ্ছে, আর আমি চলেছি পেছনে।

কিন্তু ওই বেঁটে ব্যাটাদের পেটে পেটে শয়তানী। দিলে এই টেনি শর্মাকেই একটা লেঙ্গি কষিয়ে। যেতে যেতে দেখি পাহাড়ের এক নিরিবিলি জায়গায় এক দিব্যি আমগাছ। যত না পাতা, তার চাইতে ঢের বেশি পাকা আম তাতে। একেবারে কাশীর ল্যাংড়া! দেখলে নোলা শক্‌শক্ করে ওঠে।

—আরাকানের পাহাড়ে কাশীর ল্যাংড়া!—আমি আবার কৌতূহল প্রকাশ করে ফেললাম।

—দ্যাখ্, প্যালা, ফের বাধা দিয়েছিস্ একটা চাঁটি হাঁকিয়ে—

—আহা যেতে দাও—যেতে দাও—হাবুল ঢাকাই ভাষায় বললে, পোলাপান!

—পোলাপান!—টেনিদা গর্জে উঠল: আবার বকর-বকর করলে একেবারে জল-পান করে খেয়ে ফেলব—এই বলে দিলাম, হুঁ!

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। খাস কাশীর ল্যাংড়া। কুকুরটা আমাকে একটা চোখের ইঙ্গিত করে বললে, গোটা কয়েক আম পাড়ো।

ক্যাবলা বললে, কুকুরটা আম খেতে চাইল ?

—চাইলই তো ? এ তো আর তোদের এঁটুলি কাটা নেড়ী কুত্তো নয়, সেরেফ বিলিতী গ্রে-হাউণ্ড। আম তো আম, কলা, মুলো,

গাজর, উচ্ছে, নাল্‌তে শাক, সজনেডাঁটা সবই তরিবৎ করে খায়। আমি আম পাড়তে উঠলাম। আর যেই ওঠা—টেনিদা থামল।

—কী হল ?

—যা হল তা ভয়ঙ্কর। আমগাছটা হঠাৎ জাপানী ভাষায় 'ফুজিয়ামা-টুজিয়ামা' বলে ডালপালা দিয়ে আমায় সাপটে ধরলে। তারপরেই বীরের মতো কুইক্ মার্চ। তিন-চারটে গাছও তার সঙ্গে সঙ্গে 'নিপ্পন বান্‌জাই' বলে হাঁটা আরম্ভ করলে !

—সে কি !—আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম : গাছটা তোমাকে জাপটে ধরে হাঁটতে আরম্ভ করলে !

—করলে তো। আরে, গাছ কোথায় ? স্রেফ ক্যামোফ্লেজ।

—ক্যামোফ্লেজ ! তার মানে ?

—ক্যামোফ্লেজ মানে জানিস্‌নে ? কোথাকার গাড়োল সব ! টেনিদা একটা বিকট মুখভঙ্গি করে বলল : মানে ছদ্মবেশ। জাপানীরা ও ব্যাপারে দারুণ এক্সপার্ট ছিল। জঙ্গলের মধ্যে কখনো গাছ সেজে, কখনো ঢিবি সেজে ব্যাটারা বসে থাকত। তারপর সুবিধে পেলেই—ব্যস্ !

—সর্বনাশ ! তারপর ?

—তারপর ?—টেনিদা একটা উচ্চাঙ্গের হাসি হাসল : তারপর যা হওয়ার তাই হয়ে গেল।

—কী হল ? আমরা রুদ্ধশ্বাসে বললাম, কী করলে তারপর ?

—আমাকে ধরে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গেল। ক্যামোফ্লেজটা খুলে ফেললে, তারপর বত্রিশটা কোদালে কোদালে দাঁত বের করে পৈশাচিক হাসি হাসল। কোমর থেকে ঝক্‌ঝকে একটা তরোয়াল বের করে বললে, মিস্টার, উই উইল কাট্ ইউ !

কী ভয়ানক ! ক্যাবলা আর্তনাদ করে বললে, তুমি বাঁচলে কী করে ?

—আর কী বাঁচা যায় ?—বললে, নিপ্পন বান্‌জাই—মানে জাপানের জয় হোক। তারপর তলোয়ারটা ওপরে তুলে—

হাবুল অস্ফুটস্বরে বললে, তলোয়ারটা তুলে ?

—ঝাঁ করে এক কোপ ! সঙ্গে সঙ্গে আমার মুণ্ডু নেমে গেল। তারপর রক্তে রক্তময় !

—ওরে বাবা !—আমরা তিনজনে একসঙ্গে লাফিয়ে উঠলাম ; তবে তুমি কি তা'হলে—

ভূত ? দূর গাধা, ভূত হব কেন ? ভূত হলে কারু কি ছায়া পড়ে ? আমি জলজ্যান্ত বেঁচেই আছি—কেমন ছায়া পড়েছে—দেখতে পাচ্ছিস্ না ?

আমাদের তিনজনের মাথা বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে লাগল।

হাবুল অতি কষ্টে বলতে পারল ঃ মুণ্ডু কাটা গেল, ত'াহলে তুমি বেঁচে রইলে কী করে ?

—হুঁ হুঁ, আন্দাজ করে দেখ্ দেখি—টেনিদা আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল।

—কিছু বুঝতে পারছি না—কোনো মতে বলতে পারলাম আমি ! মনে মনে ততক্ষণ রাম রাম জপ করতে শুরু করেছি। টেনিদা বলে ভুল করে তা'হলে কি এতকাল একটা স্কন্ধকাটার সঙ্গে কারবার করছি ?

—দূর গাধা—টেনিদা বিজয়গর্বে বললে, কুকুরটা পালিয়ে এল যে ?

—তাতে কী হল ?

—তবু বুঝলি না ? আরে এখানেও যে ক্যামোফ্লেজ !

—ক্যামোফ্লেজ !

আরে ধ্যাৎ। তোদের মগজে বিলকুল সব ঘুঁটে, এক ছটাকও বুদ্ধি নেই। মানে আমি টেনি শর্মা—চালাকিতে পাঁচশো জাপানীকে কিনতে পারি। মানে আমি কুকুর সেজেছিলাম, আর কুকুরটা হয়েছিল আমি। বেঁটে ব্যাটাদের শয়তানী জানতাম তো ! ওরা যখন আমার, মানে কুকুরটার মাথা কেটে ফেলেছে, সেই ফাঁকে লেজ তুলে আমি হাওয়া !

আর তার পরেই পেলাম তিন নম্বর ভিক্টোরিয়া ক্রস্‌টা !

টেনিদা পরিতৃপ্তির হাসি নিয়ে আমাদের সকলের বোকাটে মুখগুলো

পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। তারপর একটা পৈশাচিক হুঙ্কার ছাড়ল : দু' আনা পয়সা বার কর্ প্যালা, ওই গরম গরম চানাচুর যাচ্ছে।

অনুশীলনী

□ বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১ ।। টেনিদা কে ? সে কি জন্য বিখ্যাত ?

২ ।। 'ক্যামোফ্লেজ' কথাটার অর্থ কি ? টেনিদা কিভাবে ক্যামোফ্লেজের সাহায্যে জাপানীদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচিয়েছিল ?

৩ ।। 'ল্যাম্প-পোস্ট হয়ে গেলাম।'— কে ল্যাম্প-পোস্ট হয়ে গেল ? কেন ? ল্যাম্প-পোস্ট হয়ে যাওয়ার মানে কি ?

৪ ।। 'সেই যে কিসের একটা ডিম'— কোন্ প্রসঙ্গে ডিমের কথা উঠেছে ? শেষ পর্যন্ত কিভাবে ডিম-বিতর্কের ফয়সালা হয়েছিল ?

৫ ।। 'হ্যাঁ—গল্পটা বলি।'— গল্পটা কি ?

৬ ।। 'আমার একটা কুকুর ছিল।'— কার ? কি রকম কুকুর ? কুকুরটা কিভাবে মারা যায় ?

৭ ।। টেনিদার কুকুরটা কি কি খেত ?

৮ ।। টেনিদা কোন্ কৃতিত্বের জন্য তিন নম্বর ভিক্টোরিয়া ক্রস পুরস্কার পায় ?

□ সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক / মৌখিক প্রশ্ন :

১ ।। 'ক্যাবলার চোখে তখন জল আসবার জো।'— কেন ?

২ ।। টেনিদা কোথায়, কোন্ যুদ্ধে গিয়েছিল ?

৩ ।। তেরো নম্বর ডিভিসনের কম্যান্ডার হিসাবে টেনিদা কটি, কি পুরস্কার পেয়েছিল ?

৪ ।। নাক ডাকতে ডাকতে কিভাবে টেনিদা জাপানী মেরেছিল ?

৫ ।। আরাকানের পাহাড়ে টেনিদা আমগাছে কোথাকার আম দেখতে পেয়েছিল ?

৬ ।। 'আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।'— কেন ?

৭ ।। 'আমাদের তিনজনের মাথা বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে লাগল।'— কেন ?

৮ ।। 'সেই ফাঁকে লেজ তুলে আমি হাওয়া।'— কে, কিভাবে হাওয়া হয়ে গিয়েছিল ?